বহরমপুর গার্লস কলেজ পত্রিকা

২০১৯

বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও ।।
নয়কো বনে, নয়কো বিজনে, নয়কো আমার আপন মনে -
সবায় যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়, সেথায় আপন আমারও ।।

সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু সন্তু নিরাময়াঃ ।
সর্বেচ সুখিনঃ সন্তু ন কশ্চিদ্দুখঃমাপ্নুয়াৎ ।।

প্রকাশক ঃ
ড. হেনা সিনহা
অধ্যক্ষ, বহরমপুর গার্লস কলেজ

প্রকাশকাল ঃ
২৪ শে জানুয়ারী, ২০২০

পত্রিকা সম্পাদিকা ঃ
সুস্মিতা সিংহ রায়

পত্রিকা সম্পাদনায় সহযোগী অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ ঃ
ড. গীতা মণ্ডল, ড. মধুমিতা নন্দী, ড. সোমদত্তা চক্রবর্তী,
অধ্যাপিকা নূপুর লাহিড়ী, ড. সুতপা মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক বৃন্দাবন বিশ্বাস,
ড. স্মৃতিরতন ত্রিপাঠী, ড.পার্থসারথী গুহ, ড. মধু মিত্র, অধ্যাপক চিরঞ্জিত ঘোষ, শ্রী ইন্দ্রজিৎ দে এবং শ্রী নবকুমার পাল

প্রচ্ছদ অঙ্কন ঃ
প্রীতিষা দে
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ (তৃতীয় বর্ষ)

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণে ঃ
অনামিকা অফসেট প্রেস
২৬/৬২ শহীদ সূর্য্য সেন রোড, ফরেস্ট অফিসের সন্নিকটে
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
মোবাইল - ৯৪৭৫২৬০৪৫২

Rly. Station : Berhampore Court, E. R. Phone : (03482) 251193

BERHAMPORE GIRLS' COLLEGE

(Government Sponsored)
P.O.- BERHAMPORE, DIST.- MURSHIDABAD
WEST BENGAL, PIN - 742101

Members of the Governing Body of Berhampore Girls' College

1. Sri Mrinal Kanti Chakraborty	President
2. Dr. Hena Sinha	Principal & Secretary
3. Sri Nilratan Adhya	Member
4. Sri Tapan Tripathy	Member
5. Prof. (Dr.) Ashis Panigrahi	Member
6. Dr. Sujata Mukhopadhyay	Member
7. Dr. Somdatta Chakraborty	Member
8. Dr. Smritiratan Tripathi	Member
9. Dr. Khaibar Ali Miah	Member
10. Prof. Brindaban Biswas	Member
11. Sri Nabakumar Pal	Member
12. Sri Nilambar Jha	Member

শুভেচ্ছা

প্রকাশিত হতে চলেছে বাৎসরিক 'বহরমপুর গার্লস কলেজ পত্রিকা' ২০১৯। আমাদের নিত্য যাপনের গ্লানি সরিয়ে পেতে চাই জীবনের গভীর আস্বাদ, মুঠোয় ভরে নিতে চাই স্মৃতির সিন্ধুক - যা দেয় এই কলেজ পত্রিকা। কিছু অবুঝ, সবুজ মনের কলতানের প্রকাশ। অনেক স্বপ্নের আভাস - "ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত"। সেই প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমিও নন্দিত।

কেন্দ্র ও পরিধিতে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের সকলের জন্য রইল আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

হেনা সিনহা
অধ্যক্ষ
বহরমপুর গার্লস কলেজ

অধ্যক্ষ প্রীতি গুপ্ত ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব

ড. হেনা সিন্‌হা
অধ্যক্ষ, বহরমপুর গার্লস কলেজ

''অস্ত-উদয় রথে রথে
আসা যাওয়া পথে পথে
ফুল ফুটালো যারা বারে বারে
আমার দিনে আমার রাতে
আমার মধুর কল্পনাতে
জীবন আমার দিলাম তাদের করে।''
প্রীতি গুপ্ত, ১৩৭০

সর্বজন শ্রদ্ধেয়া প্রবাদ প্রতিম অধ্যক্ষ প্রীতি গুপ্ত ছিলেন বহরমপুর গার্লস কলেজের প্রাণ প্রতিষ্ঠাত্রী। সেই সঙ্গে একাধারে মুর্শিদাবাদ জেলার নারী শিক্ষার পথিকৃৎ ও সমাজসেবী। তাঁকে বর্তমান বহরমপুর শহরের অন্যতম রূপকারও বলা চলে।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ওপার বাংলায়, বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন প্রীতি গুপ্ত। পিতা শ্রী গোবিন্দলাল গুপ্ত, মাতা শ্রীযুক্তা পুণ্যলক্ষী গুপ্ত। ময়মনসিংহ জেলার বিদ্যাময় স্কুল থেকে বিদ্যালয়ের পাঠ গ্রহণ করেন এবং ঐ বিদ্যালয় থেকেই একাধিক বিষয়ে লেটার সহ বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে সংস্কৃতে সাম্মানিকসহ প্রথম শ্রেণিতে স্নাতক হন। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে সংস্কৃত সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষায় আটটি পত্রেই সর্ব্বোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলেন। কৃতী ছাত্রী হিসেবে প্রীতি গুপ্তের বিশেষ পরিচিতি ছিল।

কর্মজীবন শুরু হয় রঙপুর কলেজে অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে। তারপর শিলং লেডিকিন কলেজে কিছুদিন অধ্যাপিকা হিসাবে কাজ করার পর বিশ্বভারতীতে শ্রীসদনের তত্ত্বাবধায়িকা ছিলেন স্বল্প কিছুদিন। অতঃপর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ ফেব্রুয়ারি বহরমপুর গার্লস কলেজের অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন প্রীতি গুপ্ত। তাঁর গার্লস কলেজে যোগদানের স্মৃতিকথা — ''ফেব্রুয়ারি মাসের এক আলো-অন্ধকারে মেশা রাতের শেষ প্রহরে এসে পৌঁছলাম বহরমপুরে। এসে উঠলাম 'বেগম কুঠিতে স্টেশন থেকে শহরে ঢোকার সোজা রাস্তাটার গা ঘেঁষেই ঐ কুঠি। উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা, অনেকাংশেই ভাঙাচোরা, এক নির্জন বাড়ী। সামনে থাকে দারোয়ান আর পিছনে থাকে এক রিক্সাওয়ালা। আস্তে আস্তে সকাল হল, দারোয়ান এসে বললো, আপনি বসুন। মেমসাহেবকে খবর দিয়ে আসি।' বেলা প্রায় আটটার সময় 'মেমসাহেব' গাড়ি করে এলেন। তদানীন্তন জেলাশাসক শ্রীযুক্ত বি.জি.রাও মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী। আমাদের বেথুন কলেজের অমিয়া ব্যানার্জী। শ্রীময়ী ও ধীময়ী। বললেন 'যাক এসে গেছ। আমার দুঃখ ঘুচলো (পথিকৃৎ — প্রীতি গুপ্ত/বহরমপুর গার্লস কলেজ

পত্রিকা/প্রীতি গুপ্ত বিশেষ সংখ্যা)। গার্লস কলেজ তথা বহরমপুরবাসীর কাছে এটি শুভক্ষণ। তার তিন মাস পূর্ণ হবার আগেই ২ মে তিনি প্রতিষ্ঠাত্রী অধ্যক্ষ অমিয়া রাও এর কাছ থেকে বহরমপুর গার্লস কলেজে অধ্যক্ষের কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীযুক্ত বি.জি.রাও-এর বহরমপুর থেকে বদলির আদেশ আসে। ফলে পত্নী শ্রীমতী অমিয়া রাও কলেজের প্রথম অধ্যক্ষের বিদায় গ্রহণও অনিবার্য হয়ে পড়ে। মাত্র ৩২/৩৩ জন ছাত্রী নিয়ে যে কলেজের পথ চলা শুরু হয়েছিল, তাকে ফুলে ফলে পত্রে সুসজ্জিত মহীরুহে পরিণত করার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব প্রীতি গুপ্তের। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দ সুদীর্ঘ ২৬ বছর অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অধ্যক্ষের পদে আসীন ছিলেন। প্রীতি গুপ্তের অগাধ পাণ্ডিত্য, ছাত্রী ও সহকর্মীদের প্রতি অকুণ্ঠ দরদ ও ভালোবাসা তাঁকে মাতৃস্থানীয় করে তুলেছিল। অসাধারণ প্রশাসনিক দক্ষতা প্রশাসনিক মহলে তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাঁর বুদ্ধিমত্তা, কাঠিন্য ও কোমলতায় ভরা অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, সৃজনীশক্তি, তাঁর কল্পনা, আদর্শ, নিয়মানুবর্তিতা, অবিশ্বাস্য কর্মক্ষমতা এবং নির্ভীক অভিব্যক্তি তাঁকে কর্মরত অবস্থাতেই প্রবাদ প্রতিম করে তুলেছিল। প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একাত্মতার কারণেই এক সময় বহরমপুর গার্লস কলেজকে প্রীতি গুপ্তের কলেজ বলে উল্লেখ করা হত। একটি সদ্য প্রতিষ্ঠিত কলেজকে ২৬ বছরের নিরলস যত্নে তিনি যে উৎকর্ষ ও মর্যাদায় উন্নীত করেছিলেন কলেজের দলিল নির্ভর ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়।

কলেজের প্রতিটি ছাত্রীর প্রতি তাঁর ছিল প্রখর দৃষ্টি। ছাত্রীদের পড়াশুনার পাশাপাশি তার পারিবারিক সুবিধা-অসুবিধা, তাদের আর্থিক অবস্থা ইত্যাদির প্রতি তিনি সজাগ ছিলেন। ছাত্রীদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও সাপ্তাহিক মেডিক্যাল চেক্-আপ এর জন্য তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহে ও প্রচেষ্টায় কলেজের চিকিৎসা কেন্দ্রটি গড়ে উঠেছিল। প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পূর্বের এই চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ; বিশেষত অনগ্রসর মুর্শিদাবাদ জেলায় যখন চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল বেশ সঙ্কটজনক।

অন্যান্য গুণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর গভীর সৌন্দর্যবোধ। কলেজের বৃহৎ উদ্যানটি তাঁর প্রকৃতি প্রেম ও সৌন্দর্যানুভূতির ফসল। বাগানের কাজে নিবেদিত প্রাণ মধুমালীর সঙ্গে প্রতিনিয়ত ব্যক্তিগত ভালোলাগা ও ভালোবাসা দিয়ে নির্মাণ করেছিলেন এই বাগান। সেকালের বহু দর্শক ও পুষ্প প্রেমিকদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে পুষ্পময় রমণীয় উদ্যানটি।

বহুমুখী প্রতিভাধর প্রীতি গুপ্ত প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে অধ্যাপনার দিকটিকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। নিজেই অন্যান্য অধ্যাপকের মতো চব্বিশটি ক্লাস নিতেন। সপ্তাহে ব্যারাক স্কোয়ারের হস্টেলের সুপারের দায়িত্বও পালন করেছেন সানন্দে ও সোৎসাহে।

লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রীদের সুকুমার বৃত্তিগুলিরও যাতে পুরোপুরি উন্মেষ হয় সেজন্য চারুকলা বিভাগের তিনি প্রবর্তন করেন। ছাত্রীদের চরিত্র যাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ হয় সেজন্য বিভিন্ন উপলক্ষে শিক্ষা সাহিত্য সঙ্গীত জগতের খ্যাতিমান ব্যক্তিদের তিনি কলেজে আহ্বান করে আনতেন ও তাঁদের মূল্যবান ভাষণ শোনার ও নানাবিধ অনুষ্ঠান উপভোগের সুযোগ করে দিতেন ছাত্রীকে।

মেয়েদের মধ্যে স্বাধীনতামুখী চিন্তাধারা গড়ে উঠুক—এ বিষয়ে তাঁর সচেতনতা ছিল যথেষ্ট। বিতর্কসভা, আলোচনা চক্র ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাধীনচিন্তার বিকাশে সহায়তা করতেন। কলেজে ছাত্রী-সংসদ (ইউনিয়ন)

তৈরিতে তাঁর উৎসাহ ও প্রেরণা উল্লেখযোগ্য। গণতন্ত্র-সম্মত সুন্দর সংবিধানের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল সেদিন ছাত্রী-সংসদ যা আজও অনুসৃত হয়ে আসছে। সেই সংবিধান আজকের পরিস্থিতিতে যথেষ্ট উপযোগী, এ কারণেই কলেজের বাইরের গুণীজনের দ্বারা বিশেষভাবে সমাদৃতও।

অনন্য-সাধারণ সেই সংবিধানের ভিত্তিতে রচিত বিভাগগুলির নামের মধ্যেই তাঁর স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয় — আনন্দন বিভাগ, ছাত্রী কল্যাণ বিভাগ, বিরাম ভবন, বিতর্ক বিভাগ, পত্রিকা বিভাগ, ক্রীড়া বিভাগ, বিজ্ঞান বিভাগ ইত্যাদি। একজন সাধারণ সম্পাদিকা তার ছাত্রী সংসদকে নিয়ে নির্বাচনে জয়ী হয়ে এক বছরের জন্য কলেজের ভাল-মন্দের দিশারী হয়ে থাকত।

প্রীতি গুপ্তের উদারতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভাবনার দিকটিও উল্লেখ করতে হয়। জেলার মুসলিম মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জগতে প্রবেশ করার সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রীতি গুপ্তের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাঁর চিন্তার পরিচ্ছন্নতা, মানবিকতা, ঐক্যবোধ সমগ্র মহাবিদ্যালয়ে এক সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বাতাবরণ গড়ে তুলেছিল। এই কলেজের সরস্বতীপূজা তাই হয়ে উঠেছিল সর্বধর্ম, সর্বস্তরেব ছাত্রীদের এক আনন্দ উৎসব। কৃষ্ণনাথ কলেজে যখন হিন্দু হস্টেল, মুসলিম হস্টেলের পৃথক অস্তিত্ব বহরমপুর গার্লস কলেজ তখন একটিই ছাত্রীনিবাস যেখানে সর্বধর্মের ছাত্রীদের একত্রে বসবাস। সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রবাদ প্রতিম রেজাউল করিম সাহেবকে কলেজে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে প্রীতি গুপ্তের এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। করিম সাহেবকে তাঁর দেখা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের মর্যাদা দিয়েছিলেন। শিবরাত্রির উপবাসের পর যখন ছাত্রীরা ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য ব্রাহ্মণের খোঁজ করছিল তখন প্রীতি গুপ্ত করিম সাহেবকেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলে অভিহিত করেন। মেয়েরা সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে ভোজন করিয়ে ব্রতভঙ্গ করে। সেই সময়ের সমাজ ব্যবস্থায় প্রীতি গুপ্তের ওই উদারতা ও মহানুভবতা আমাদের হতবাক করে।

কলেজের সঙ্কটকালেও প্রীতি গুপ্ত থাকতেন অবিচল। ১৯৭১/৭২ খ্রিষ্টাব্দে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে তীব্র নকশাল আন্দোলন। শিক্ষা জগতের সেই ঘোরতর সঙ্কটের দিনে যখন পশ্চিমবঙ্গের কলেজের অধ্যক্ষরা পরীক্ষা নিতে সাহস পাচ্ছেন না তখন গার্লস কলেজের টেস্ট পরীক্ষা যথাযথভাবেই হয়েছিল। পুলিশ দিয়ে নয় - সমস্ত শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে নির্বিঘ্নে।

পঠন-পাঠন পরিসরের বাইরে সমাজসেবামূলক কাজেও প্রীতি গুপ্তের ভূমিকা ছিল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বহরমপুরে এসেই তিনি দেশবিভাগের ফলে বহরমপুরের উপকণ্ঠে বসতি স্থাপন করা ছিন্ন মূল উদ্বাস্তুদের কল্যাণার্থে শহরের অভিজাত মহিলাদের নিয়ে মহিলা সমিতি গড়ে তোলেন। ছাত্রী, স্কুলশিক্ষিকা ও অধ্যাপিকা দের নিয়ে অর্থ ও ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করে তার সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল রিলিফ সোসাইটি (যার সভাপতি ছিলেন ডঃ মেঘনাদ সাহা) থেকে আসা ওষুধপত্র নিয়ে প্রীতি গুপ্ত উদ্বাস্তু কলোনীতে বিলি করতেন। ছাত্রীদের দিয়ে নাটক করিয়ে সংগৃহীত অর্থ ত্রাণের কাজে ব্যয় করে তার উদ্বৃত্ত অর্থ কোলকাতার স্টুডেন্টস হেলথ হোমে ছাত্র-ছাত্রীদের চিকিৎসাকার্যে প্রদান করেন। সেইসময় বহরমপুর গার্লস কলেজ শুধু একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না - ছিল অসহায়ের পরম আশ্রয় প্রতিশ্রুত ভূখণ্ড।

বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধেও তাঁর ভূমিকা অসামান্য। পূর্ব পাকিস্তানে খান সেনাদের অত্যাচারে জেলায় পালিয়ে আসা নিগৃহীতদের তিনি যেমন পরম মমতায় আশ্রয় দিয়েছেন তেমন বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সমিতির

সভানেত্রীরূপে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনে মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। শিক্ষক- অধ্যাপক ও অন্যান্য চাকুরিজীবীদের এক দিনের বেতন নিয়ে ফাণ্ড তৈরী করে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ব্যয় করা হয়েছিল। নানা ত্রাণসামগ্রী, ওষুধপত্র, গুঁড়োদুধ প্রভৃতি ত্রাণশিবিরে ও লালগোলায় গড়ে ওঠা অস্থায়ী হাসপাতালে প্রদান করা হত।

রবীন্দ্রভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত প্রীতি গুপ্ত এই সংস্কৃতিমনস্ক শহরকে দিয়ে গেছেন রবীন্দ্রসদন-এর মতো প্রতিষ্ঠান যা আজও স্ব-মহিমায় বিরাজমান। কয়েকটি যুবককে রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করতে দেখে একটি স্থায়ী রবীন্দ্রমঞ্চ গড়ে তোলার ভাবনা থেকেই রবীন্দ্রসদনের সৃষ্টি।

মূলত তাঁর উদ্যোগে এই শহরে রবীন্দ্রভাবধারার প্রসারের উদ্দেশ্যে বহরমপুর রবীন্দ্রমেলার প্রতিষ্ঠা হয়। রবীন্দ্র নৃত্য-গীত, গীতিনাট্য, কবিতা পাঠ-আবৃত্তির মধ্য দিয়ে যে সুরের আগুন জেলার শহরে ও গ্রামে ছড়িয়ে দেবার সূচনা করেন তা অব্যাহত। কেবলমাত্র স্কুল কলেজ নয়, যে কোনো সংস্কৃতি মানুষ মেলায় সামিল হন এবং পক্ষকাল ধরে তা শহরবাসীকে রবীন্দ্র ভাবচেতনার আনন্দে মাতিয়ে রাখে।

কলেজ থেকে অবসরগ্রহণের পরেও তিনি ছিলেন তাঁর প্রাণের কলেজ ও বহরমপুর শহরের নিত্য শুভাকাঙ্খি। ২০০২ খ্রিষ্টাব্দের ১ নভেম্বর প্রীতি গুপ্ত অমরলোকে যাত্রা করেছেন। গার্লস কলেজের প্রতিটি গৃহকোণে, প্রতিটি গাছ, লতা, ঘাস-পাতা জুড়েই তাঁর অস্তিত্ব আজও বিদ্যমান। কলেজ সঙ্গীতের রচয়িতা প্রীতি গুপ্তের স্মরণে কলেজে বেশ কয়েক বছর ধরে শিক্ষক দিবসে স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হচ্ছে। কলেজের বাইরেও তাঁকে স্মরণ করলে আমরা আমাদের মাতৃ-ঋণ কিছুটা হলেও স্বীকার করতে পারি। তাঁকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই। অধ্যক্ষ প্রীতি গুপ্তের অতি যত্ন ও আন্তরিকতায় সৃষ্ট আত্মজাসমক এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে ঐতিহ্য তিনি রচনা করেছেন তাকে রক্ষা করা ও আরো উন্নত জায়গায় প্রতিষ্ঠা করাই হোক আমাদের আজকের অঙ্গীকার।

Two Stars Twinkling In The Sky

Keya Ghatak
Associate Professor in English

Culture of Berhampore Girls' college is a happy synthesis of divergent experiences of our respected teachers. It has been a powerful all-absorbing and all-embracing process. In the past it has received, adopted and digested elements of different cultures of different teachers. In fact, each new influence has enriched the culture made it more powerful. The charm and graciousness of the way of life endures due to the philosophy of life which we have received from our senior respected teachers of this college.

I have been enriched by love, experience and sense of discipline of two senior superannuated teachers, Putul Di and Mary Di, who have left the world to complete their struggle for existence. Their sense of intellectual and moral discipline of a high order had enriched the academic garden of Berhampore Girls' college. Putul Di used to spend a few valuable hours of each day of her life for maintaining the natural beauty of garden of Berhampore Girls' College. She lived for the welfare of other teachers and students. Without her inspiration, it was not possible for me to open my service book. She taught me the lesson of how to open a service book. She became the idol of the student community. She was both with them and of them. Her lectures and conversations proved a perpetual source of inspiration. As a Bursar of our college, she had performed her duties and responsibilities very sincerely. she used to keep record of each and every thing of our college by using Computer. Her skill in using Computer had created a strong desire in my mind to learn the lesson of using Computer properly. This desire had forced me to learn the art of Computer from my son and daughter. After her death, her husband has offered a large amount of money to enrich the academic atmosphere of our college.

Mary di along with her group always tried to help me to run the hostel smoothly. When I was the Teacher-in — Charge of this college, the advice of Mery di, Kana di and Minati di helped me to go forward in the journey of administrative life of Berhampore Girls' College. They always inspired me by telling me the stories of our founder Principal Amiya Rao and Principal Priti

Gupta. Principal Amiya Rao and her husband B.G. Rao had planted a sapling of knowledge known as Berhampore Girls' College. Principal Priti Gupta had turned the sapling into a tree of knowledge with flowers and fruits by giving soul into the life of the sapling. Their efforts have made me spell bound. The effort of Mary di to donate a large number of books to enrich the library of Berhampore Girls' College at the time of my acting as teacher in Charge, created a special type of pleasure in my mind. I had also enjoyed the same sense of pleasure to get a large number of books in our library donated by our founder Principal Amiya Rao.

Both Putul Di and Mary Di were great teachers who, by their knowledge, character, and day to day life, left the profoundest influence on the intellectual and moral character of their pupils. They were not women to be daunted. They were successful to perform their duties as educationists. As teachers, both of them not only instructed their pupils but also inspired them. They left the permanent stamp of their personality on their moral character. Both of them bore a very high character and were much respected by every one of our college. Both friends and foes honoured them for their intelligence, courage, and many human qualities.

They had great patience, reflection and self-discipline to recognise the voice of conscience. They were free from passion, self-love and egotism. Conscience was their guide and guardian. They knew it very well that discipline was necessary both for the teacher and the taught. They were successful to keep a high image of their personality in society. They taught the students that there was no short cut to success and it was only through consistent hard work and self-discipline that they could achieve their objective in life. Their human qualities drew all students to them. Performance of good work that was beneficial to college, was their principal concern.

I come to know from them that deeds are more important than the number of years we live. Life is too sweet a gift, too priceless a possession to be trifled with. Only we are not to love it overmuch. We must not rush into danger merely to show off our reckless disregard of it. But when duty calls or conscience dictates, we must not shirk it for fear of danger. We are marching forward in the journey of our service life, widening every moment the circle of

human achievements, out-distancing every day the landmarks set up by our predecessors of our college. Their lives tell us of the progress achieved in the different fields of life of our college from time to time. We march forward and we are inspired by the urge to go farther and yet farther. We learn not only what things have been achieved, but how they have been achieved.

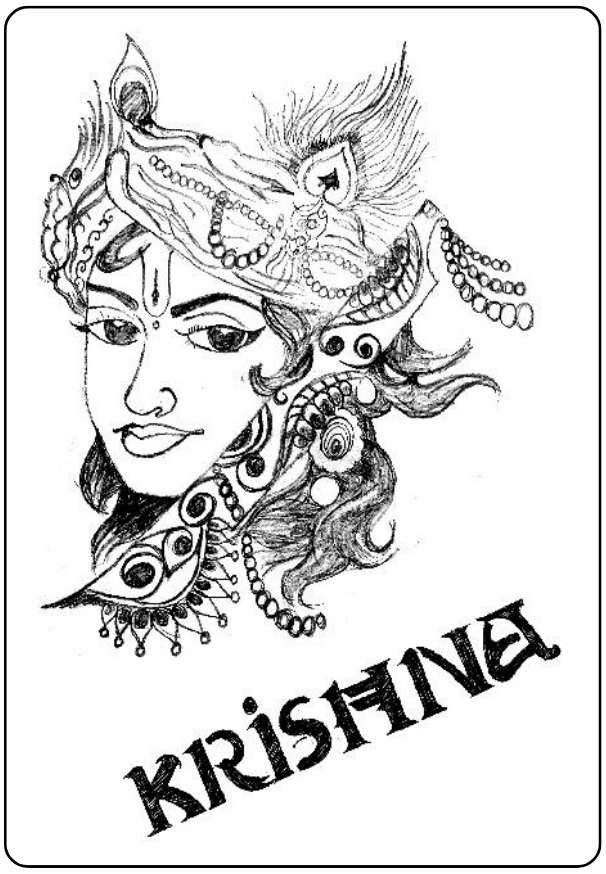

মেঘা রানী চন্দ্র
ইংলিশ বিভাগ, ১ম বর্ষ

আমার দুঃখিনী মায়ের বাংলা ভাষা

অধ্যাপক চিরঞ্জিত ঘোষ
বহরমপুর গার্লস কলেজ, বাংলা বিভাগ

‘মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা!
তোমার কোলে, তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালবাসা!’

ঠিকই ধরেছেন বাংলা ভাষা নিয়ে বলবো আমি। তবে হ্যাঁ, গর্বের বাংলা নয়; দুঃখিনী মায়ের বাংলা ভাষা। লিখতে গিয়ে চোখে জল এসে যাচ্ছে, তবুও লিখছি কেন জানেন! আমার কলমই পারে আপনাদেরকে একটি ক্ষয়িষ্ণু জাতির জীর্ণতার কথা ব্যক্ত করতে। সম্প্রতি বাঙালি জাতির দৌলতে বাংলা ভাষা ধুকধুক করে একরকম প্রায় কৃত্রিমভাবে বেঁচে আছে। যতই ২৫ শে বৈশাখ, ২২ শে শ্রাবণ ও ২১ শে ফেব্রুয়ারি পালন করি না কেন আমরা; বাংলা ভাষার ব্যবহারগত ও শিক্ষাগত প্রয়োগ আজ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে গর্বিত বাঙালিরা তাঁর কতটুকুরই বা খবর রাখেন। কিন্তু আমি বলবো, আমরা সেই ধন্য বাঙালি জাতি, যাঁরা তাঁদের মাতৃভাষাকে খুন করছে (সচেতন বা অবচেতনভাবে তা আপনারা বিচার করুন)। চলুন দেখে নিই, আজকের বাঙালি ও বাংলা ভাষাঃ

এখানে আমি কয়েকটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা উল্লেখ করব — যার মাধ্যমে ফুটে উঠবে আমার মাতৃভাষার অবহেলিত জীবনের কথা। বর্তমানে আমি কর্মসূত্রে বহরমপুরে থাকলেও নানাবিধ কারণে কমবেশি কলকাতায় যাতায়াত করতে হয়। আজ থেকে বছর খানেক আগে একদিন সকালে বহরমপুর কোর্ট স্টেশন থেকে ভাগীরথী এক্সপ্রেস ট্রেনে চেপে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে বিশেষ কারণে রওনা হয়েছি। আমার সঙ্গে রয়েছে ‘‘আনন্দবাজার’’ পত্রিকা ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘গল্প সমগ্র’ ১ (‘দে’জের বই)। এরাই আমার চলতি পথের (বিশেষত ট্রেনে) একান্ত সঙ্গী হয়ে থাকে সাধারণত। সংরক্ষিত কামরার স্ব-আসনে জানালার ধারে বসে সকালের ঠাণ্ডা-নরম হাওয়া খেতে খেতে আমি আপনমনে শীর্ষেন্দুর গল্প পড়ে চলেছি। আমার পাশের আসনে বসে থাকা নিপাট ‘‘বাঙালি ভদ্রলোক’টি (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) আমাকে আজকের কাগজটি চাইলেন—যা ট্রেনে-বাসে-ট্রামে সচরাচর হয়ে থাকে। আমি ভদ্রলোকটির দিকে এক ঝলক তাকিয়েই বাংলা কাগজটি দিয়ে পূর্ববশত পাঠে মনোনিবেশ করলাম। ট্রেন কৃষ্ণনগর স্টেশন পৌঁছোবার পূর্বেই বাঙালিবাবুর সঙ্গে আমার জমাটি ভাব হয়ে গেল। আলোচনা হল বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ শহরের সংস্কৃতি, গল্প ইত্যাদি নানারকমের কথা। যা’হোক, শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছোবার পূর্বে এও জানতে পারলাম তিনিও যাদবপুর যাচ্ছেন। এর ফলে আমি তো বেশ খুশি হয়েই শিয়ালদহের স্টেশন থেকে বেরিয়ে একই ট্যাক্সিতে উভয়েই পুনরায় পাশাপাশি আসনে বসে গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। ওমা! এবার বাঙালি ভদ্রলোককে দেখে আমি তো হঠাৎই আশ্চর্যই হয়ে গেলাম। কেননা, তিনি অনভিজ্ঞ ট্যাক্সি-চালককে হিন্দি ভাষায় যাদবপুর যাওয়ার রাস্তা বর্ণনা করছেন। অথচ, চালকটি বেশ গোছানো বাংলায় কথাবার্তা বলে চলেছেন। এমতাবস্থায়,

আমি আমার সহযাত্রীকে দেখে বেশ লজ্জা ও মানসিকভাবে আঘাত পেলাম। সুতরাং, আমি বাকি পথ 'বাঙালি ভদ্রলোক'টির সঙ্গে আর একটিও বাক্য না করে 'বাঙালি জাতির ও বাংলা ভাষা'র চূড়ান্ত অপমান যে আজ কোন্ স্তরে পৌঁছেছে—তা উপলব্ধি করলাম।

আরেকটি ঘটনার কথা আপনাদের বলি — এটারও কেন্দ্রবিন্দু অবশ্য 'বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা'। গত মাস চারেক আগে ঘটে যাওয়া এক পড়ন্ত বিকেলের গল্পকথা নয়, একেবারে খাঁটি বাস্তব কথা। আমার এক দূরসম্পর্কের মামা একদিন বিকেলে স্ত্রী ও সদ্য উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ একমাত্র পুত্র অর্ণবকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এলেন। যতদূর জানি, মামা পেশায় ওকালতি করেন এবং তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ মামীমা স্কুলে বাংলা পড়ায়। তাঁরা আমার মায়ের সঙ্গে গল্পগুজব করছেন। আমার সঙ্গে আলাপ না থাকায় আমি নিজ ঘরে কিছু একটা টুকিটাকি করছিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই মা তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় পর্ব ঘটিয়ে খাবারের আয়োজন করতে লাগলেন। একাধিক গল্প ও বিবিধ কথা চলাচলি হচ্ছিল তাঁদের সঙ্গে আমার। মনে হল সন্ধ্যেটা বেশ মনোরম কাটছে আমাদের আজকে। এদিকে অর্ণব আমার বইয়ের আলমারির দিকে কেমন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। তার চোখের ভাষা না বুঝেই আমি তাকে বলে উঠলাম, 'বই নেবে? পড়তে চাও? নাও না কেন, কোন ভয় নেই! যে বইটি তোমার পছন্দ, সেটিই নিয়ে পড়তে পারো।' অমার এই কথা শুনে অর্ণব এবার করুণ কণ্ঠে বলে ফেলল, 'দাদা, আমি তো বাংলা বই পড়তে পারি না।' আমি বললাম, 'কেন?' সে বলল, 'আমি তো কোনদিনই বাংলা লিখতে পড়তে শিখিনি! আমাকে ছোট থেকেই ইংরেজি মাধ্যমে পড়তে হয়েছে। কেবলমাত্র বাংলায় কথা বলা ছাড়া কিছুই পারি না।' তার দুঃখের কথা শুনে আমি কষ্ট পেলেও কোনরূপ সান্ত্বনা বাক্য আমার জানা ছিল না। কিন্তু এদিকে অর্ণবের মা এরূপ কথা শুনে একপাটি দাঁত বের করে হেসে বলে উঠলেন, 'আচ্ছা আপনি বলুন তো, আমি আপনি ছাড়া আজকাল আর ক'জন 'বাংলা-টাংলা' পড়ে? আর পড়েই বা হবে কী! আর কিছুদিন পর তো ইংরেজি ছাড়া এক পা-ও ফেলা যাবে না।' আমি অবাক নয়নে ভদ্রমহিলার দিকে তীব্র শ্লেষের ইঙ্গিতে বলে ফেললাম, 'বোঝো কাণ্ড!' সুতরাং সেদিনের কথা বলার ঢঙে আমার যে তীব্র ব্যঙ্গ ও কশাঘাত মেশানো ছিল, তার আঁচ 'গর্বিত বাঙালি দম্পতি' আত্তীকরণ করেছিল কিনা — তা ঈশ্বরই জানেন।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, ইদানিং বাংলা বচনে ইংরেজি শব্দ বলার চলন শুরু হয়েছে। আর এটি ব্যবহার করে সাধারণত স্কুল-কলেজ পড়ুয়ারা। যেমন, বৃষ্টি পড়লে তারা তাদের বন্ধু বা বান্ধবীদের বলে, 'আজ বৃষ্টি পড়ছে 'বাট্' স্কুলে যাবো না'। ইত্যাদি নানা জাতীয় 'বাংরেজি' বাক্য। এখানেও আমার প্রশ্ন, তারা না পারছে ইংরেজি ভাষা গিলতে অথবা না পারছে তাদের মাতৃভাষা বাংলা শুদ্ধভাবে শিখতে। এতদ্‌সত্ত্বেও, আমাদের বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই। এইভাবে 'বাঙালি ভদ্রলোক', 'অর্ণবের মা-বাবা' ও সদ্য গজিয়ে ওঠা 'ছাত্র-ছাত্রী'রা নিজেদের বাঙালি বলে গর্ববোধ করলেও তাঁরা দুঃখিনী মায়ের ভাষাকে কতটুকু মর্যাদা দিচ্ছে—তা একুশ শতকের আপামর বাঙালিদের আজ ভাববার সময় এসেছে। সুতরাং, বক্তব্যের ইতি টানতে রবীন্দ্রনাথের উক্তিই ধার করে বলি, 'সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী, / রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ কর নি।'

——✧✧——

অধ্যাপক রেজাউল করীম এবং বহরমপুর বালিকা বিদ্যালয়

জিনিয়া পাল চৌধুরী
(বাংলা বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ)

'বয়সের সিঁড়ি বেয়ে ভুলে গেছি সব —
কত কথা, মানুষ, ঘটনা দেশ কাল।
. . . .
দেখতে পেয়েছি সেই মানুষটিকে
সূর্য হয়েও যিনি মাটির প্রদীপ।
আজ দেখি সমাদৃত সূর্য পরিচয় —
. . . .
মুখে সেই স্বর্গীয় হাসি অম্লান।'[১]

— এই কবিতার মাধ্যমে একজন বিশিষ্ট মনীষীর কথা বলা হয়েছে যিনি বহরমপুর বালিকা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক তথা প্রাবন্ধিক-স্বাধীনতা সংগ্রামী; তিনি আর কেউ নন তিনি হলেন অধ্যাপক রেজাউল করীম। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বীরভূম জেলার রামপুরহাটের অন্তর্গত শাসপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর কর্মভূমি তথা প্রয়াণস্থল হল আমাদের এই বহরমপুর শহর।

১৯৪৬ সালে আমাদের বহরমপুর গার্লস কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এইখানেই রেজাউল করীম ১৯৪৮ সালের ১৫ জুলাই ইংরেজির অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন।[২] তিনি ইংরেজির অধ্যাপক হয়েও শোনা যায় — প্রথম দিকে বাংলাও পড়াতেন।

এই কলেজেরই ছাত্রী (পরবর্তীতে যিনি এই কলেজের গ্রন্থাগারিক হয়েছিলেন) শ্রীযুক্তা কণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকেই তিনি ক্লাসে কেমন পড়াতেন তা জানা যায়। ইংরেজি সাহিত্য কঠিন হওয়া সত্ত্বেও তিনি অতি যত্নে সহজভাবে তা ক্লাসে বোঝাতেন। ইংরেজি কবিতাগুলি আবৃত্তি করিয়ে ছাত্রীদের মুখস্থ করাতেন।[৩] অনেক সময় কোনো ইংরেজি নাটক পড়ানোর সময় সেই নাটকের কোনো দৃশ্য অভিনয় করে দেখাতেন যাতে ছাত্রীরা খুব সহজেই বুঝতে পারে বা মনে রাখে। মাঝে মাঝে রোম্যান্টিসিজমের কথা বোঝাবার জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতা বা গানের লাইন ব্যবহার করতেন। অনেক ক্ষেত্রেই শেক্সপীয়র পড়াতে পড়াতে তিনি রবীন্দ্র বিষয়ে আলোচনা শুরু করে দিতেন। রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-চেতনা তাঁর মধ্যেও প্রকাশ পেত।

করীম সাহেব প্রত্যেক বিদ্যার্থীদের উৎসাহ দিতেন। সদ্যপ্রয়াতা একসময় এই কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্রী এবং পৃথকরূপে অধ্যাপিকা মেরী সরকারের নিকট হতে জানা যায় যে, তিনি প্রত্যেক ছাত্রীর প্রতি এমনভাবে লক্ষ রাখতেন যাতে তাদের পড়া বুঝতে কোনো অসুবিধা না হয়। তিনি ছাত্রীদেরকে উপদেশ দিতেন পড়ার

জন্য — আরো বেশী পড়ার জন্য যাতে তারা বিদ্যার মাধ্যমে জীবন সার্থক করে তুলতে পারে।[৪] ক্লাসের পশ্চাৎপদ ছাত্রীদের ঘাটতি পূরণের জন্যে তিনি অন্য সময়ে তাদেরকে পড়া বোঝাতেন। যথার্থ ছাত্রীদরদী বলতে যা বোঝায় এককথায় তিনি তাই ছিলেন। ধর্মীয় দিক থেকে পৃথক ধর্মাবলম্বী হলেও তিনি কিন্তু জাতিধর্মের ভেদাভেদ করতেন না, গীতাপাঠের জন্য সকল ছাত্রীদের উৎসাহ দিতেন, এতে তাঁর প্রতি সকলের শ্রদ্ধা আরো বর্ধিত হত।

ক্লাসে পড়াতে পড়াতে কোনো ছাত্রী কথা বললে তিনি খুব অসন্তুষ্ট হতেন এবং নিজের কাছে ডেকে তাকে কোমলভাবে বুঝিয়ে দিতেন যে ক্লাসে কথা বলা তিনি পছন্দ করেন না।[৫] কাউকে কোনোদিনও তিনি কঠোরভাবে শাস্তি দিয়েছেন বলে জানা যায় না।

একসময় এই কলেজে কবি শঙ্খ ঘোষ রেজাউল করীমের সঙ্গে সহকর্মীরূপে যোগদান করেছিলেন। তিনি করীম সাহেবের সঙ্গে একদিন গল্প করার সময় তার কাছে ছাত্রীদের আবদারের কথা শোনেন। করীম স্যারের কাছে ছাত্রীরা নাকি আবদার জানায় যে তাদের টেস্ট পরীক্ষা আসন্ন অতএব তাদের শিক্ষক মহাশয় যেন প্রশ্নসংখ্যা কমিয়ে দেন। শিক্ষক মহাশয়ও ছাত্রীদের আবদার না মেনে থাকতে পারেননি। কিন্তু প্রশ্ন তিনি কমিয়ে দিলেও ছাত্রীরা নাছোড় বান্দা। তারা চেয়েছিল যেহেতু ছয়টি প্রশ্ন আসবে, তাদের অধ্যাপক সাহেব যেন তাদের ছয়টি প্রশ্নই পড়তে দেন।[৬] কিন্তু করীম সাহেব তা আর শোনেননি, সাতটা প্রশ্নই পড়তে দিয়েছিলেন।

নানা কর্মব্যস্ততাতেও কলেজে তাঁর উপস্থিতি নিয়মিত ছিল। একবার তাঁর জঙ্গীপুরে এক মিটিং থাকায় তিনি আসতে পারেননি কিন্তু তাঁর ক্লাসের সময় অন্য একজন অধ্যাপককে তিনি বলে রেখেছিলেন যে ঐ ক্লাসে যেন তিনি যান। কিন্তু একটু দেরীতে হলেও সেই দিনই জঙ্গীপুর থেকে সরাসরি কলেজে এসে ক্লাস নিয়েছিলেন করীম সাহেব। কলেজ সর্বোপরি ছাত্রীদের প্রতি তার ভালোবাসার কথা বলাই বাহুল্য। তাঁর নিজের কথাই সেই সাক্ষ্য দেয় 'তোমাদের বাবা-মা কত কষ্ট করে পড়াশুনা করার লেগে তোমাদের কলেজে পাঠিয়েছেন। নিজের কাজ করার জন্য আমি তোমাদের আজ পড়াব না-তাকি হতে পারে মা?[৭] কলেজের প্রতি যে একটা প্রগাঢ় টান ছিল তাঁর, এই কথাতেই সেটা বোঝা যায়।

কলেজের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকতেন — অসুস্থ শরীর নিয়েও। একবার ১৯৯২ সালের আগস্ট মাসে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ২৪ জানুয়ারি কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবসে সবাইকে চমকে দিয়ে তিনি কলেজে আসেন এবং বক্তৃতাও দেন। কলেজের প্রায় প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে তার ভাষণ ছিল প্রধানতম বিষয়। তিনি ছাত্রীদের বলতেন —

'সকলকে বলে রেখেছি — আগে গার্লস কলেজের ... অনুষ্ঠানে যাব, তারপর অন্য কোথাও।'[৮]

আজও এই কলেজের প্রধান আকর্ষক অনুষ্ঠান হল সরস্বতী পূজা। ছাত্রীদের সঙ্গে একসঙ্গে আহার করতেন, একই সারিতে দাঁড়িয়ে তিনিও পূজোয় অংশগ্রহণ করতেন। তাঁর কাছে যর্থাথই 'সব ধর্মই সত্য' ছিল।

তিনি অধ্যাপনার পাশাপাশি কলেজ লাইব্রেরিতেও বহু সময় কাটাতেন — বই পড়তেন। লাইব্রেরি ছিল তাঁর প্রাণপ্রিয়। লাইব্রেরি কর্মীদেরও তিনি বই পড়ার উপদেশ দিতেন।[৯]

১৯৪৮ সালের ১৫ ই জুলাই কলেজে প্রবেশের মাধ্যমে দীর্ঘ তেত্রিশ বছর অধ্যাপনার পরে আশির দশকের প্রথম দিকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

তাঁর সাহিত্যিক অবদানের জন্য ১৯৮৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হতে তাঁকে ডি. লিট উপাধি প্রদান করা হয়। শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি কলকাতায় যেতে না পারলে তার প্রাণপ্রিয় গার্লস কলেজে এসেই মাননীয় উপাচার্য মহাশয় তাঁকে এই সম্মানে ভূষিত করেন।[১০]

কলেজে অধ্যাপক থাকাকালীন তাঁকে কেন্দ্র করে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে। একটা সময়ে সকল অধ্যাপকগণ একশো পঁচিশ টাকা বেতন পেতেন কিন্তু ভুলবশত কলেজ থেকে করীম সাহেব বহুদিন ধরে পঁচাত্তর টাকাই মাহিনা পেয়ে আসছিলেন। কিন্তু তিনি কাউকে এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে কিছু জানাননি। তবে শেষমেশ এই ঘটনাটি ধরা পড়লে কলেজ কর্তৃপক্ষের লজ্জার চেয়ে বরং তিনিই যেন অধিক লজ্জিত হয়ে সসংকোচে বলেছিলেন —

'আরে ছি ছি, না - না, এতে কী হয়েছে, আমার তো তেমন কোনো অসুবিধেই হচ্ছিল না কিছু।'[১১]

তাঁর কাছে পড়ানোটাই উদ্দেশ্য ছিল — বেতন নয়।

করীম সাহেবের অধ্যাপনাপর্বের শেষের দিকের প্রায় এক দশক ব্যতীত কলেজের অধ্যক্ষা ছিলেন প্রীতি গুপ্তা। প্রীতি গুপ্ত তাঁকে 'অনির্ব্বাণ প্রদীপ' বলে অভিহিত করেছিলেন। তিনি আরো বলেছিলেন —

'শিক্ষাদানে, বিদ্যাদানে, সম্পদে আনন্দদানে,
বিপদে অভয়দানে, উদ্যমে প্রেরণাদানে
যিনি (করীম সাহেব) কখনো পশ্চাৎপদ হননি।'[১২]

একবার কলেজের মেয়েরা শিবপুজোর উপবাস করে তা ভাঙার জন্য ব্রাহ্মণের খোঁজ করছিল। প্রীতি গুপ্ত তা শুনে বলেছিলেন যে রেজাউল করীমের থেকে বড়ো ব্রাহ্মণ মনে হয় আর কেউ নেই। এর থেকে বোঝা যায় তিনি নিজে অধ্যক্ষা হয়েও অধ্যাপক করীম সাহেবকে কতটা শ্রদ্ধা করতেন! তিনি অধ্যাপক সাহেব প্রসঙ্গে আরো বলেছিলেন —

'পরিচিত, স্বল্পপরিচিত, যারাই তাঁকে জানেন স্মরণ করবেন তাঁর অসামান্য সৌজন্যের কথা,
শুভ্র হাসির আলোয় উদ্ভাসিত সদাপ্রসন্ন আননের কথা, যেখানে কোনও স্বার্থ,
কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতার কুটিলতা রেখাপাত করেনি।'[১৩]

সবশেষে বলতে চাই, এই অসামান্য, বিরলপ্রায় মানুষটিকে দেখার সৌভাগ্য যদিও আমার হয়নি কিন্তু তাঁর সম্পর্কে যা কিছু জেনেছি তাতে এই মানুষটির প্রতি আমার শ্রদ্ধা-সম্মান আজীবন অটুট থাকবে। এ হেন মহামানবের সান্নিধ্য লাভ করে আমাদের কলেজ এবং তাঁর জীবনদর্শন অনুভব করে আমরা ধন্য। তাঁর প্রতি আমার শত কোটি প্রণাম নিবেদন করি। প্রবন্ধের ইতি করি করীম সাহবেরে প্রতি নিবেদিত করীম সাহেবেরই ছাত্রী তথা আমাদের কলেজের প্রাক্তনী শামসুন নাহারের কবিতার মাধ্যমে —

'তোমারে স্মরি নতশিরে নয়ন জলেতে ভেসে
ধন্য হলাম বহরমপুর গার্লস কলেজে এসে।

তথ্যসূত্র ঃ—

১। চিত্রা চৌধুরী ঃ 'সূর্য পরিচয়' কবিতা, 'স্মরণিকা — রেজাউল করীম স্মরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য' প্রীতী গুপ্ত (উদ্যোক্তা), বহরমপুর গার্লস কলেজ, ৫ নভেম্বর ১৯৯৪, পৃষ্ঠা - ১২।

২। সায়ন্তন মজুমদার ঃ 'সম্প্রীতির প্রাণময় মূর্তি রেজাউল করীম', ২০১১

৩। কণা বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ৪ ডিসেম্বর ১৯৯৩ সালে বহরমপুর গার্লস কলেজে রেজাউল করীমের স্মরণ সভায় পঠিত স্মৃতিচারণামূলক প্রবন্ধ, 'স্মরণিকা - রেজাউল করীম স্মরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৩

৪। মেরী সরকার ঃ ৪ ডিসেম্বর ১৯৯৩ সালে বহরমপুর গার্লস কলেজে রেজাউল করীমের স্মরণ সভায় পঠিত স্মৃতিচারণামূলক প্রবন্ধ, 'স্মরণিকা - রেজাউল করীম স্মরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৬

৫। চৈতালী সাহা ঃ 'এক আশ্চর্য মানুষ' প্রবন্ধ, 'স্মরণিকা - রেজাউল করীম স্মরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য,' প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৮

৬। শঙ্খ ঘোষ ঃ 'এখন সব অলীক', প্রথম প্রকাশ ২২ শ্রাবণ ১৪০১, দ্বিতীয় সংস্করণ ১ শ্রাবণ ১৪০৫, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ১০৬-০৭

৭। কণা বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৪

৮। তদেব

৯। আশীষ কুমার মণ্ডল ঃ 'আমার দেখা অধ্যাপক রেজাউল করীম', 'স্মরণিকা - রেজাউল করীম স্মরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য', প্রীতি গুপ্ত (উদ্যোক্তা), বহরমপুর গার্লস কলেজ, ৫ নভেম্বর ১৯৯৪, পৃষ্ঠা - ২২

১০। সায়ন্তন মজুমদার ঃ 'সম্প্রীতির প্রাণময় মূর্তি রেজাউল করীম', ২০১১

১১। শঙ্খ ঘোষঃ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১০৯

১২। প্রীতি গুপ্ত ঃ 'অনির্ব্বান প্রদীপ', 'স্মরণিকা — রেজাউল করীম স্মরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য', প্রীতি গুপ্ত (উদ্যোক্তা), বহরমপুর গার্লস কলেজ, ৫ নভেম্বর ১৯৯৪।

১৩। তদেব।

১৪। শামসুন নাহার ঃ '' 'রেজাউল করীম' স্মরণে'', 'স্মরণিকা — রেজাউল করীম স্মরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য', প্রীতি গুপ্ত (উদ্যোক্তা), বহরমপুর গার্লস কলেজ, ৫ নভেম্বর ১৯৯৪, পৃষ্ঠা - ১৬

বাঁশবাগানের দৈত্যপুরী

মেঘারানী চন্দ্র
(প্রথম বর্ষ)

মনের দুঃখে ভুতুম হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের শেষ প্রান্তের বাগানে এসে ঢুকে পড়েছে। গ্রামের এই শেষ প্রান্তে একটা বড়ো বাঁশগাছ আছে। আনমেন হাঁটতে হাঁটতে ও বুঝতেই পারেনি কখন ও এই বাগানে ঢুকেছে। এদিকে সন্ধ্যেও ঘনিয়ে এসেছে। বাঁশবাগানের মাথায় আর একটু পরই অমাবস্যার চাঁদ উঠবে আর গোটা পাঁচকড়ি গ্রামে ঝুপ করে অন্ধকার নেমে আসবে। পাড়ার এই বাঁশঝাড় নিয়ে অনেক কানাঘুষো আছে। কেউ বলে এখানে ডাইনিরা থাকে আবার কেউ বলে ব্রহ্মদৈত্যি তো কেউ বলে এখানে এক মন্ত্রসিদ্ধ ভয়ঙ্কর তান্ত্রিক থাকে আর কোনো মানুষ তার সামনে রাত্রে বেলায় পড়লেই ধরে নিয়ে নরবলি দেয়। অথচ এই তান্ত্রিক নাকী অদৃশ্য ইচ্ছে হলে তবেই দেখা দেন। যাইহোক আজ ভুতুমের সত্যি মন খারাপ। আজ স্কুলে তার রেজাল্ট বেরিয়েছে। সে অঙ্কে ১৫, বাংলায় ২২, আর ইংরেজীতে ২৫ পেয়েছে। যদিও সে তার আশানুরুপ ফলই পেয়ছে। কারন সে অঙ্কের খাতায় জ্যামিতির বদলে ভূগোলের ম্যাপ আর বাংলার খাতায় গরুর রচনার জায়গায় পলাশির যুদ্ধ লিখে এসেছে। তাই সে জানতো যে এরম ই ফল পাবে। আসলে তার এত গুলো বিষয় পড়তে গিয়ে মাথা ভোঁ ভোঁ করে। সে বাংলাতে ইতিহাস আর অঙ্কে ভূগোল করে আসে। স্কুল ছুটি হবার পর ভুতুম গুটি গুটি পায়ে বাড়িতে ঢোকে। বাড়িতে ঢোকা মাত্রই ওর বাবা ওর রেজাল্ট টা নিয়ে বেশ মনযোগ দিয়ে দেখেন যদিও দেখার মতো কিছুই ছিল না কারন উনিও জানতেন ওনার ছেলে এরমই নম্বর পাবে। ওর বাবা শ্যামাচরণ বাবু বেশ গম্ভীর মেজাজের লোক, কারোর সাথেই বেশি দরকার না পড়লে খুব একটা কথা বলেন না। ভুতুমের সব থেকে এটাই বেশি অবাক লাগে যে ওর বাবা কোনো হাসির সিনেমা দেখেও হাসেন না অথচ বলেন - ''ওহে এতো ভীষণ হাসির সিনেমা। আর হাসতে পারছি না যে!'' সে অবাক হয়ে দেখে ওর বাবার গোঁফের তেলায় কিন্তু এতটাকু হাসিব চিহমাত্র নেই। ওর বাবা একজন নামকরা জজ। ওর বাবার ওই বজ্রকঠোর চাহনি দেখলেই আসামীরা সব সত্যি এমনিই বলে দেয়। গীতা ছোঁয়াবার আর দরকারই পড়ে না তা ভুতুম তো কোন ছাড়। তারওপর আজ আবার তার মা বাড়ি নেই না হলে মা ঠিক ভুতুম কে বাঁচিয়ে নিতেন ওর বাবার রাগ থেকে। তাই আজ যেন তার একটু বেশিই ভয় করতে লাগল। শ্যামাচরণ বাবু খুব মন দিয়ে রেজাল্ট দেখার পর ঘর কাঁপানো গলায় বলেন আজ থেকে ভুতুমের বাইরে খেলতে যাওয়া আর সবরকম তেলেভাজা খাওয়া বন্ধ যতদিন না সে ভালো রেজাল্ট করতে পারছে। তার যেন মনে হল আবার আওয়াজে ঘরের মেঝে টা যেন বারকয়েক কেঁপে উঠল। তারপর আবার ওর ছোটো বোন মিঠাই ওর সামনে তেলেভাজা খেতে খেত বলল -

''ভারী মজা ভারী মজা!
ভুতুম পেল মস্ত সাজা।
তেলেভাজা হল বন্ধ
আমাদের ভারী আনন্দ।''

এই কথার পর সেই যে ভুতুম বাড়ি ছেড়েছে সন্ধ্যে হয়ে গেছে তবুও ফেরেনি। অথচ ওর পেটে খিদেয়ে ছুঁচোয় ডন বৈঠক করছে। রাগ করে না খেয়ে বাড়ি ছেড়েছে। একবার তো রাগের মাথায় ভেবেওছিল যে সন্ন্যাসী হবে। তারপরনানা কারনে ও সে আইডিয়া টা বাতিল করল। এদিকে সে অন্ধকারে আনমনে হাঁটতে হাঁটতে একটা বাঁশের সাথে পা আটকে ধড়াম করে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারালো। যখন তার জ্ঞান ফিরলো ভুতুম অবাক হয়ে তার চারিপাশে দেখল। সে দেখল তার পাশ দিয়ে একটা নদী বইছে কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় নদী টা ক্ষীরের। চারপাশে প্রচুর গাছ রয়েছে আর তাতে ঠিক ফলের মতোই চকলেট ঝুলছে, কোথাও টফি, ললিপপ। আরও আশ্চর্য হয়ে সে দেখল যে এখানে পশ্চিম দিকে সূর্য উঠেছে আর সূর্য টা ভীষণ রঙচঙে। কিন্তু ওর স্পষ্ট মনে আছে যে ও যখন হোঁচট খেলো তখন রাত ছিল। ও উঠে ভাবতে ভাবতে এগিয়ে গেল যে সে কোথায় এসে পড়ল। আবার ধারে কাছে ও কাউকে দেখতেও পাচ্ছে না জিজ্ঞেস করবে! যাইহোক হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দেখল যে একজায়গায় একটা টয় ট্রেন আছে আর তারমধ্যে একটা নীল রঙের লোক বসে আছে। লোক টা ওকে দেখতে পাওয়া মাত্রই ডাকল। ভুতুম কাছে গিয়ে লোকটাকে আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করল যে সে কোথায় এসে পড়েছে? লোকটা বলল

- এটা দৈত্যপুরী গো খোঁকা। কিন্তু তুমি ভয় পেও না। আমরা বাচ্চাদের ভয় দেখায় না। বরং আদর করে রেখে দি। আর আমি এখানের এক দৈত্য।

- আচ্ছা দৈত্য কাকু আমি এখানে এলাম কী করে? আমি তো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম যে!

- হ্যাঁ কিন্তু তুমি যে বাঁশে ঠোকর খেয়ে অজ্ঞান হয়েছিল ওটা হল দৈত্যপুরীর দরজা। তোমার পা লাগাতে ওটা খুলে যায় আর তুম তখনই এখানে এস পড়।

- কিন্তু আমি বাড়ি যাব কী করে?

- কেন তোমার বুজি এখানে ভালো লাগছে না?

- ভালো তো লাগছে কিন্তু ....

ভুতুমের মনে পড়ল যে বাড়িতে বাবা আছেন এখনও। মনে মনে ভাবল বাড়ি যাবার থেকে এখানে থাকা ভালো। এখানে পড়াশোনাও নেই। সে বলল

- আমি কী এই জায়গা গুলো ঘুরতে পারি দৈত্য কাকা?

- নিশ্চয় খোঁকা।

ওদিকে ভুতুম রাতে বাড়িতে না ফেরায় সবাই চিন্তায় পড়েছেন। তার মাও ইতিমধ্যে এসে গিয়ছেন। তিনি কেঁদে-কেটে বাড়ি মাথায় তুলেছেন আর শ্যামচরণ বাবু কে বলেছেন যে ভুতুম কে না এনে দিলে তিনি মিঠাই কে নিয়ে দেশত্যাগী হবেন। শ্যামাচরণ কে দাগী আসামী রা ভয় খেলেও এই শ্যামাচরণই কিন্তু জব্দ একজনের কাছে ... তার বউ ক্ষান্তমণি দেবীর কাছে। যাইহোক শ্যামাচরণ বাবু চারিদিকে ভুতুমের খোঁজ করতে লোক পাঠিয়েছেন। তারমেধ্যই একজন লোক বলল যে সে ভুতুমকে বাঁশবাগানে যেতে দেখেছিলেন কিন্তু তখন তিনি আফিমের নেশায় মত্ত ছিলেন বলে ওকে ডাকেন নি। আর সময় নষ্ট না করেই শ্যামাচরণ কিছু লোকলস্কর নিয়ে বাঁশবাগানের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। কারণ তিনিও বাঁশবাগান সম্পর্কে অনেক কিছুই শুনেছেন যদিও তিনি বিশ্বাস করেন না। তবে জঙ্গলে সাপ-সোপ তো থাকতেই পারে।

ওদিকে ভুতুম তো বেশ আনন্দেই আছে। নীল দৈত্যের সাথে তার বেশ ভাবও জমেছে। কিন্তু হঠাৎ নীল দৈত্য বলল

- পরীক্ষায় কম নম্বর পেয়েছ বলে কেউ কী বাড়ি ছাড়ে?

সে অবাক হয়ে বলল - কিন্তু তুমি জানলে কী করে?

- আমরা সব জানি।

- কিন্তু আমি বাড়ি যাব না।

- তা বললে হয়! তোমার মা-বাবা যে তোমার জন্য চিন্তা করছে।

- কিন্তু আমার যে পড়াশোনা করতে ভালো লাগেনা। সব গুলিয়ে যায়। বাংলায় ইতিহাস আর অঙ্কে ভূগোল করে দিয়ে আসি। আর তাই রেজাল্ট খালাপ হয় আর বাবা রেগে গিয়ে এমন করে তাকোন যে আমার রক্ত জল হয়ে যায় গো কাকু।

- তোমরা ছোটো। তাই তোমাদের মন এত চঞ্চল। আচ্ছা আমি তোমার এই সমস্যার সমাধান করতে পারি কিন্তু তোমাকেও কথা দিতে হবে যে তোমাকে মন দিয়ে পড়তে হবে।

- আচ্ছা দিলাম কথা। অবার তো বলো!

- হ্যাঁ। বলছি! তোমাকে আমি আমার একটা বুদ্ধি দেব। তোমাকে আমি বুদ্ধি দিলাম ঠিকই কিন্তু তোমাকেও চেষ্টা করতে হবে আর পড়াশোনায় মন বসাতে হবে। নাহলে কিন্তু কোনো কাজ হবে না।

- ঠিক আছে তবে তাই হোক।

- আচ্ছা এবার আমি তোমাকে এই দৈত্যপুরী থেকে তোমার নিজের জগতে নিয়ে যাব। কিন্তু তোমার মনে হবে যে তুমি এটা স্বপ্ন দেখেছো। যদিও এটা সত্যি। আর তুমি চাইলেও এই স্বপ্নের কথা কাউকে বলতে পারবে না। বুঝলে?

- তাহলে আমি কী আর কোনোদিনও এখানে আসতে পারব না। তোমার সাথে খেলতে পারব না?

- ওই যে বললাম তোমার এটা স্বপ্ন মনে হবে। চলো ভোর হয়ে আসছে। এবার তোমাকে তোমার দেশে পৌঁছে দি!

ভুতুম হঠাৎ করে নড়ে উঠল। চোখ মেলে দেখল সে সেই বাঁশাবাগানের মধ্যেই আছে। ভোর হয়ে আসছে। সে দূর থেকে দেখতে পেল যে তার বাবা এবং গ্রামের আরও কিছু লোক হাতে, লাঠি হ্যারিকেন নিয়ে তাকে খুঁজতে আসছে। ভুতুম উঠে পড়ল। ওর মাথাটা যেন একটু ভারী ভারী লাগল। বোধহয় কাল রাতের চোট পাওয়ার দরুন। তার এবার মনে পড়ল গত রাতে সে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখেছে। যদিও সে কথা সে কাউকেও বলল না। তার বাবা তাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। বাড়ি ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে ভুতুম পড়তে বসল। অঙ্কের বই খুলে তার মনে হল সে যেন পারবে অঙ্ক গুলো। সে চটপট করেও ফেলল গুটিকয়েক অঙ্ক। যথারীতি তার বার্ষিক পরীক্ষার সময় এল। তার মনে হল এবার সে পরীক্ষা ভালো দিয়েছে। কিন্তু সে একথা কাউকে বলল না। ঠিক সময়ে পরীক্ষার রেজাল্টও বেরোল আর দেখা গেল ভুতুম সব বিষয়ে একশো না পেলেও অঙ্কে সে এবার ৮০, বাংলায় ৮৯, ইংরাজীতে ৮৮ এবং অন্যান্য বিষয়েও ভালো নম্বর পেয়ে পাশ করেছে। এই খবর শুনে ভুতুমের বাবা জ্ঞান হারালেন। তবে তিনি খুশিও হলেন এবং আবার তাকে খেলেত

যেতে আর তেলেভাজা খেতে অনুমতি দিলেন। তার এবার সত্যি মনে হল বাঁশবাগানে সে ওটা স্বপ্ন দেখেলি না সত্যি ওটা ওর সাথে হয়েছিল? এ প্রশের উত্তর আজও সে পায়নি।

তবে পাঠক-পাঠিকা গণ আপনাদের কী মনে হয় এটা সত্যি না স্বপ্ন? পড়ে অবশ্যই বলেন কিন্তু।

——✧✧——

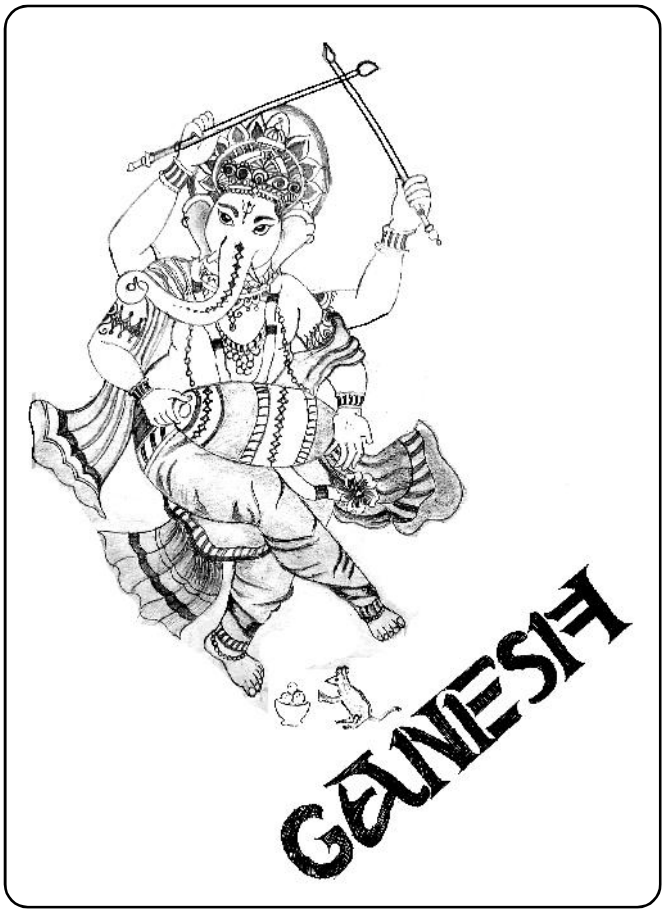

মেঘা রানী চন্দ্র
ইংলিশ বিভাগ, ১ম বর্ষ

দত্তক গ্রহণ ও সামাজিক ধারণা

ব্রততী বাগ
(শারীরবিদ্যা বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ)

আমার মনে আছে খুব ছোটোতে বাড়ির বড়ো দাদা-দিদিরা আমাকে শেখাতো আমি নাকি "Adopted"। সত্যি কথা বলতে "Adopted" জিনিসটা আসলে কি! Adopted মানে! সেটা ভালো জিনিস না খারাপ আমি না জেনেই কথাটা শুনে খুব কষ্ট পেতাম। খুব ভয় হতো, মনে হতো একদিন হয়তো আমাকে বাবা মা এর থেকে অনেক দূরে চলে যেতে হবে। ভাবলেই চোখে অন্ধকার দেখতাম ভয় হতো আমার খুব। এখন সেসব কথা ভাবলে হাসি পায়।

তখন তো আমি অবুঝ ছিলাম কিন্তু অবাক হয় এটা জানতে পেরে আমার চারিপাশের মানুষগুলোও আজও "Adoptation" ব্যাপারটাকে সেকেণ্ড চয়েস হিসেবেই দেখে থাকেন, তাদের ধারণা কোনো দম্পতি তখনই বাচ্চা Adopt করে যখন তাদের মধ্যে কোনো একজন সন্তানের জন্ম দিতে অক্ষম হয়, অদ্ভুত না?

আমি নিজেই বাড়িতে একদিন অপ্রাসঙ্গিক আড্ডায় বাচ্চা Adopt করার কথা বলতেই সবাই কেমন চুপ করে গেলো। কিছুক্ষণ হাসাহাসির পর একজন বয়স্ক পিসি বলে উঠলেন, ''পর কখনও আপন হয় না"।

আমি তাদের বুঝিয়ে উঠতে পারিনি যখন কোনো বাচ্চাকে আমি Adopt করবো তার মানেই তো তাকে একটা নতুন জীবন দেওয়া। যেটা একজন মায়ের প্রথম কর্তব্য বলে মনে করি আমি।

'You gave life such a way that saved one'

আমার মনে হয় কি জানেন তো আমাদের প্রত্যেকের একটা (অন্তত) করে বাচ্চা Adopt করা উচিত। আফটার অল প্রত্যেকটি শিশুর একটি সুস্থ পরিবেশ ও পরিবার পাবে।

ভারতে ২৩ নভেম্বর National Adaptation day হিসেবে পালন করা হয়। অন্তত পক্ষে দুই থেকে চার বছর লাগে পুরোপুরি একটি বাচ্চা Adopt করতে। ভারতবর্ষে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির অনুমতি ছাড়া বাচ্চা Adopt করা যায় না। একজন শারিরীক ও মানসিক দিক থেকে সুস্থ দম্পতিই এবং আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল বাচ্চা Adopt নিতে পারবেন। বর্তমানে একজন সিঙ্গেল মাদার বা সিঙ্গেল মাদার ও সন্তান Adopt করতে পারলেন।

Adoptation ব্যাপারটাকে নিজের অক্ষমতার কারণ না বানিয়ে একজন শিশুকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন দান করুন। পরিবার কিন্তু শুধুমাত্র জিন দিয়ে নির্ধারিত হয় না। ভালোবাসা লাগে।

অবলা কথা

প্রকৃতি লক্ষী সিংহ
(ইংরেজী বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ)

রূপে রমনীয়, গুণে কমণীয়, সদা কামনীয় — কারো বর্ণনা দিচ্ছি!, আরে না না বর্ণনা নয়, আশা আকাঙ্খা বা চাওয়া বলতে পারেন। বর্ণনার ভাব দেখেই বোঝা হয়ে গিয়েছিল নিশ্চয় কোনো নারী বোধ হয়, তাই না! হ্যাঁ এভাবেই আমরা চাই, চেয়ে এসেছি আর হয়ত চাইবও। এই আমরা কারা! 'পুরুষ সিংহেরা' নাকি 'নারী বাঘিনী' থুড়ি 'বাহিনী' বা! — না না নেহি। তৃতীয় লিঙ্গই বা বাদ থাকে কেন! সেকেলে নাকি?

কখনও ভেবে দেখেছেন এই 'আমরা' কারা? বা 'বুল্টি ছোটো জামা পড়লে লোকে কি বলবে?' — এই 'লোক' গুলো কে! বা 'বাবনের চাকরি না হলে সবাই বুঝে নেবে ও টুকে নাম্বারের বড়াই করত' — এই 'সবাই' কারা! —

নাহ্; ভাবেননি, কেউ ভাবেনা — আমি না, তুমি না, কেউ না। কারণ, এখানে এই সর্বনামগুলো মোটেই নির্দিষ্ট নয় — ওরা সাপেক্ষ; তোমার ক্ষেত্রে আমি আর আমার ক্ষেত্রে তুমি। তবে ক্ষেত্রগুলো কিছুটা হলেও নির্দিষ্ট, মানে জানা হয়ে যায় আর কী। যেমন ধরুন 'কালো' — এই বিশেষণটি নারীদের ক্ষেত্রে যতটা ক্ষতিকর পুরুষের ক্ষেত্রে অতটা অসুবিধের নয়; বা সাবলম্বী না হওয়াটা পুরুষের ক্ষেত্রে যতটা লজ্জার নারীদের ক্ষেত্রে ততটা অসম্মানের নয়। তবে কিছু কমন্ বা সাধারণ জিনিস আছে যার অভাব দুই লিঙ্গ হোক বা অপর অন্যটি সর্বক্ষেত্রে অনুভব করা অস্বাভাবিক কিছু নয় — সেটা হলো 'টাকা', হ্যাঁ এ জিনিস যার কাছে থাকে সে নারকেল গাছেও আলু ফলাতে পারে বা এভাবেই গিয়ে মাছের বাজার খুলতেই পারে। বিক্রি হবেই ভাই। 'কেউ' কিছু বলবে না, 'সবাই' মাথায় তুলে রাখবে। আধুনিক ভাষায় 'পাবলিক খাবেই বস্'। এই 'আমরা' তখন নীরবই থাকব। কারণ মুখ খুললে যদি ক্ষতি হয়! কেউ যদি রাস্তায় ফেলে পেটায় তখন তো আর 'পাবলিক' বা 'কেউ' ঘেউ - রা আসবে না — 'ওরা' শুধুই দেখে, শোনে আর সমালোচনা করে, থুড়ি Troll করে — ওগুলো করতে পয়সা লাগে না তাই আর কী। যদিও কেউ পয়সা দেয়ও না ওই তবু মনটা ভলো থাকে।

এবার বলি 'ওরা' কারা। 'ওরা' তারাই যারা মানসিকভাবে এই আমার বা তোমার থেকে কিছুটা অসুস্থ, কিঞ্চিৎ নির্ভরশীল বলা যায়। যেমন — অন্যকে খারাপ না বললে যারা আয়নার সামনে আত্মবল পান না; 'ওরা' তারাই যাদের অন্যের সন্তানের ভবিষ্যৎ আলোচনা না করলে নিজের অপত্যদের বড্ড বেকার বেকার লাগে; 'ওরা' তারাই যারা অন্যের বর্ণবিশ্লেষণ' না করলে জাত হারানোর ভয় পান; 'ওরা' তারাই যারা সভা-সমিতিতে নারীবাদের ভাষণ দিয়ে অঠারো বছরের মেয়ের জন্য পাত্র খোঁজেন, 'ওরা' তাঁরাই যাঁরা পাত্রী চাই-এর বিজ্ঞাপনে ফর্সা মুখ খোঁজেন, 'ওরা' তারাই যারা যোগ্যতার ঝল্সানিতে কোটা (Caste) খোঁজেন।

তাই বলছি এই ওদের থেকে লুকোবেন না, বলতে শিখুন অবলা না হয়ে, বাঁচতে শিখুন; বিশ্বাস করুন এভাবেই ওদের সান্ত্বনা দেওয়া যায়।

বাক্স বন্দি

প্রীতি দাস
(বাংলা বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ)

আমার বিয়ে হওয়া ৫ বছর হয়েছে এ সংসারে। এ সংসারে আসার পর থেকে নিজেকে সংকুচিত করে মানিয়েই যাচ্ছি প্রতিটা মুহূর্তে। বাড়ির সবকাজ সামলে নিয়ে করলেও আমার চলাফেরা থেকে শুরু করে প্রতিটা কাজে আমার স্বামীর সন্দেহ হত। কোনোদিন যদি আমার উপর সন্দেহ জাগতো সারাদিনের পরে রাত্রের খাবারটাও আর ঠিকমতো খাওয়া হতো না।

আমি বাড়ির মধ্যেই বেশি থাকতাম, বাইরে তেমন বেড়াতে দিত না আমাকে। পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথেও তেমন মেলামেশা করতে দিত না। কোন জিনিসের খুব প্রয়োজন হলে নিজে কিনে এনে দিত আমাকে। আমি যে বাড়ির বাইরে সামান্যতম পা রাখি সেটাও ওর পছন্দ হতো না। এতদিন ধরে নিজেকে ওরমতো করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টাতেই পড়ে আছি। দিনে বা রাত্রে যখনই নিজেকে একা মনে হত আর যখন আমার উপর সন্দেহের মিথ্যে অভিযোগ চাপিয়ে দেওয়া হত ঠিক সেই সময় বাড়ির ছাদটাই যেন আমাকে আশ্রয় দিত খোলা আকাশের মতো।

আমাদের বাড়িটাও চারিদিক দিয়ে ঘেরাঘোরা ছিল। শুধু বারান্দার জানালাগুলো মাঝে মাঝে খুলতে এতো ইচ্ছে করতো কিন্তু তাও পারতাম না। বিয়ে হওয়ার পর যেদিন প্রথম আসলাম এ বাড়িতে সেদিনই রাহুল বলে দিয়েছিল যে, — 'আমি তোমাকে যথেষ্ট ভালোবাসবো কিন্তু এই মিডিলক্লাস ফ্যামিলির মেয়েদের মতো অতো বাইরের দিকে মন দেওয়া চলবে না। ঘরে থাকবে বইটই পড়বে বা অন্যকাজ করবে কিন্তু বাইরে যাওয়ার অতো দরকার নেই। যা লাগবে আমাকে বলবে, সব তোমার সামনে এনে দেব।' সেদিন-ই বুঝেছিলাম আমার স্বাধীনতার একবিন্দুও এই বাড়িতে অবশিষ্ট থাকবে না। আর ঠিক সেইভাবেই নিজেকে মানিয়ে নিতে শিখলাম।

সেদিন ভোরবেলা একটু আগেই ঘুম ভেঙেছিল, উঠে বাইরের দিকের জানালাটা খুলতেই যেন একরাশি রোদ আমার অন্ধকার মুহূর্তটাকে একটুর জন্য হলেও আনন্দে ভরিয়ে তুলেছিল। অনেকক্ষণ বাইরের প্রকৃতিটাকে উপভোগ করতে ইচ্ছে হলো। হঠাৎ রাহুল এসে রেগে জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে বললো — 'এখন অতো বাইরে তাকানো কিসের! বলেছিনা রাস্তার ধারের জানালাটা বেশি খুলবে না।' তার সঙ্গে আরও কত কথা শোনালো, সেদিন সারাটাদিন ওই সামান্য কথাতেই আমার উপর রেগে থাকলো। আমি শেষে নিজেকেই মাঝে মাঝে ধিক্কার দিতে থাকি নিজের ভুলের জন্য।

সেদিনই রাত্রিবেলা ওই ১০ টার দিকে রাহুল বাড়ি ফিরল। প্রতিদিনের মতো সেদিনও আমার খাওয়া হয়নি। ভাবলাম আজ আমি আমার ইচ্ছে গুলোর কথা রাহুলকে বলবো। আর এই পরাধীনতার বেড়ি নিয়ে এ জীবন কাটাতে পারবো না। প্রতিটা মূহুর্তে নিজেকে সংকুচিত করেছি বলেই হইতো এভাবে ওর কাছে আমি মূল্যহীন হয়ে পড়ছি। আমারও ইচ্ছে আছে, আমিও বাঁচতে চাই আমার মতো, আমিও ব্যস্ততার মধ্যে ভালোবাসাটাকে নতুন করে পেতে চাই।

পাশের ঘর থেকে এ ঘরে ঢুকে দেখি রাহুল খাবার খেয়ে কেবলই শুতে যাবে আমি ওকে ডাকলাম সব কথা বলতে চেষ্টা করলাম। খুব কষ্টে প্রথম কথাটা বলতে শুরু করলাম। রাগে ওর যেন আর সহ্যের সীমা থাকছিল না। ও হয়তো বুঝতে পারলো যে আমারও সহ্যের সীমা আজ খোলা আকাশের মতো ওর কাছে তুলে ধরতে চাইছি। আবার হঠাৎ করে গায়ে হাত তুলতেই আমি আজ আটকাতে গেছি নিজের হাত দিয়ে, কিন্তু ওই পাশবিক লোকটার জোরে সমুদ্রে দেওয়া একবিন্দু বাঁধের মতো নিজেই আবার অসহ্য যন্ত্রণায় তলিয়ে গেলাম। গোটা শরীর যন্ত্রণায় ভরে উঠলো। কানের পাশ দিয়ে রক্ত গড়ে পড়তে শুরু করলো, আমি ক্লান্ত শরীরটাকে সামলাতে না পেরে খাটের উপর লুটিয়ে পরলাম।

রাত্রি ঠিক ২ টোর দিকে আমার ঘুম ভাঙলো। এক অসাধারণ কোমল ক্লান্তিহীন শান্তি নিয়ে জেগে উঠলাম, কান্নাও যেন পেল না। আস্তে আস্তে ছাদে গেলাম। চারিদিকের অন্ধকার এই খোলা আকাশটুকুই যেন আমার নিত্যদিনের সঙ্গি। কিন্তু হঠাৎ রাহুল ছাদে আসতেই নিজেকে ভাসানো এই অন্ধকার মায়া থেকে বেড়িয়ে আসলাম। আমি ভাবলাম হয়তো আমাকে কোন কারণে ডাকতে এসেছে কিন্তু ও ছাদে উঠে আমাকে দেখলো না। আমিও নিজেকে একটু আড়াল করে ওর ফোনের কথাগুলো শুনতে লাগলাম। কাকে যেন ফোনে একটু ভয়ে ভয়ে কী বললো তারপর নীচে নেমে আসলো। আমিও নিজেকে লুকিয়ে লুকিয়ে ওর পিছনে আসলাম। হঠাৎ দেখি আমার বাড়তি কাপড় রাখা সেই পুরোনো বাক্সটা খুব কষ্টে খাটের তল থেকে বার করলো। সব জামাকাপড় তাড়াহুড়ো করে বার করে ফেললো। আর শেষে যেটা দেখলাম তারপর আমি নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমার দেহটাকে প্রথমে বাক্সতে ভরতে গেল কিন্তু আমি হয়তো তার মাপের ছিলাম না। রাহুল কী করে দেহটাকে বাক্সে ভরবে এই ভাবনা নিয়ে ঘরের এককোণে রাখা কাঠের হুরকোটা দিয়ে আমার হাত পা দুটোকে মেরে মেরে বাক্স অনুযায়ী করে আমাকে তার মধ্যে ফেলেদিল। ওর দুটো হাত রক্তে মাখানো ছিল কিন্তু ওর মনে একবিন্দু ভয়ও যেন আর দেখা গেল না। দক্ষশিল্পীর মতো কপালের ঘামটা মুছে বাক্সটাকে কিছুটা কষ্ট করে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে বেড়িয়ে গেল।

——✧✧——

রাত

নীপাঞ্জলি রায়
(ইংলিশ বিভাগ, প্রথম বর্ষ)

এক একটা রাত্রির বড্ড স্নেহাতুর। তারার নরম আলোয় ঠাম্মাদের বুকের ওম মিশে থাকে। য্যোৎস্না ফোঁটায় ফোঁটায় চুঁইয়ে পড়ে বালতির কানায়। মোটা ফুলের কষ্টে গন্ধে আর নিমফলের হাওয়ায় বাতাস ভারি হয়ে থাকে, হাতে সরষের তেল মেখে ঠাম্মি যখন থোড় কাটতে বসে তখন তার গা দিয়ে ঠিক অমন গন্ধ বের হত।

কোন রাত্রী রাগী মুখের মত গোমরা। যেন হাঁ করা দতৎযিদানো আর রাজ পুত্তুরের যুদ্ধ শুরু হল বলো ঘন কালো পর্দা চিরে ভেসে আসে পেঁচার ডাক....ভুতুম হুমাথমথম করে াকাশ, যেন এখনই সাপটে পুরে নেবে অন্ধকারের মুঠোয়। জানলার পাশের পেয়ারা গাছের নীচে অল্প ঝপাটির শব্দ, অস্ফুট গোঙানি.... সাপে ব্যাঙ ধরেছে। কালছে রক্তের গন্ধ পাক দিয়ে ওঠে।

কিন্ত রাত বড্ড দীর্ঘ, বৃদ্ধ অভিজ্ঞতায় দীর্ণ জীবনের মত। শুকতারা টা পশ্চিমে ঢলতে ঢলতে মুচকি হাসে। দরজার পাশেরাখা লণ্ঠনের নিবু নিবু আলোয় দেওয়াল জুড়ে ছায়াদের ইতিহাস ..... স্মৃতি। টুপটাপ হিম পড়ে। ইচ্ছে করে ঠাম্মির পান-সুপুরির গন্ধ মেখে ঘুম যেতে।

একেকদিন ঘুম আসে না। তখন শিয়রে সাজিয়ে রাখি মনকমেন, রাগ, হিংসে, আনন্দ আর ভালোবাসাদের। তারপর পরতে পরতে অন্ধকারমুড়ি দিয়ে তলিয়ে যাই। একটা দুটো করে ঘুম টুপ করে নমে আসে চোখের পাতায়। দোক্তাপাতার গন্ধ আর সোনার চুড়ির দুয়েকটা রিনরিনে শব্দ আধোঘুমে হাত বুলিয়ে যায়। বাতাস ফিসফিস করে ওঠে, ''ঘুমোও, দিদিভাই ঘুমোও।..

দেখা-শোনা-দিনগোনা

প্রকৃতি লক্ষী সিংহ
(ইংরেজি বিভাগ, চতুর্থ বর্ষ)

অনুকরণের ভার অনুসরণের থেকে কতখানি কম তা নিয়ে বিচার করার সময় বাঙালির কাল ও ছিল না, আজও নেই। তাই কোনো মহাত্মা বা গুণীজনের গল্প বা জীবনচরিত শুনলেই তাঁর স্বার্থহীন দেশাচার, লোকাচার বা ত্যাগমহিমাকে অক্লেশে না শোনা করে, দূর থেকে শুধু ঊনাদের কী নেই কী নেই খুঁজে চলি। 'নেই-এর মধ্যে কোনো 'নেই' তো নিজের মধ্যে মিলবেই! হাজার গলেও পৃথিবী গোল। সময়ও বোধ করি গোলই হবে। নইলে 'History respects itself' সূত্রের Philosophical Distance ঠিক কত Kilometer - এ মাপা যায়, তা স্বয়ং রবিঠাকুর তো বলে যাননি তাই প্রবাদ ও আমরা বানিয়ে ফেলেছি। সূত্রানুসারে, পাড়ার গলির আড্ডাখোর ছেলেটাও বিরাট কোহলির ছাঁটে চুল কাটে, পাড়ার দাদুকে দেখে সিহারেট লুকাবে কেন! কোহলি সেরম কিছু করেন — সেটা তো কোথাও লেখা নেই।

এবার আসি একটু অন্য বিষয়ে, আজকাল এই Digital যুগে অসময়ে অকারণে যথা ইচ্ছা তথাই বসন্ত চলে আসে। ফুল ফুটেছে কি না ফুটেছে জানা নেই; কারণ ফেসবুকে গাছ লাগালে সে গাছে ফুল ধরে না, Newspeed ধরে। এই অকাল বসন্তের কারণে বাড়িতে কোনোদিন পূজোয় না বসা ছেলেটাও প্রেম করার সময় অক্লেশেই নিজেকে রাধারমন ভেবে বসে। গীতার একটিও শ্লোকের মানে জানা বা বোঝা — সে অন্য কথা। আজকাল সবকিছুই লোকদেখানো লোকাকর্ষক করতে গিয়ে কোথায় যেন নকল এসে আসলকে রাহুর মতো তা দেখে মজা নেয়। সেদিন দেখলাম কোনো এক Digital পুরোহিত কোনো এক তথাকথিত hit গানে ভগবানের মূর্তির সামনে উদ্দাম নেত্য করে আরতি করছেন, তাতে ভগবান কতটা খুশি হচ্ছেন জানা নেই, তবে আশেপাশের জনগণ খোরাক পেয়ে বেশ খুশি; অতঃপর ভিডিও ভাইরাল। বহুকাল আগে শুনেছি দেবতারা নৃত্য দেখে খুশি হয়ে বরদান করতেন তবে আমার এই ছোট্টো মস্তিস্কে সেগুলিকে Classical এবং নির্দিষ্ট রীতিনীতি মেনে পূজা অর্চনারূপ মনে হয়। এ নেত্য সে নৃত্য মনে হতে কোথায় যেন বাঁধে। ঊনাদের বিভিন্ন মুদ্রা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি - কর্ম - স্থানের পরিচায়ক বা নির্দেশক; আর এ নেত্য কেবলই মুদ্রাদোষ বলে মনে হয়। ফলস্বরূপ গরিব পটুয়া খেতে পান না, ভাটিয়ালি ভাইরাল হয়না, লোকগীতির Location Change হয় - মেশে DJ remix টাকা থাকলে দুঃখও শৌখিন, সেখানে না খেতে পাওয়া শিল্পীরা খালিপেটে নম হয় - চাষা। হারিয়ে যায় গৌরব আমাদেরই ভিড়ে।

গৌরবের সৌরভ নেবার সময় কোথায় এখন। যা তাড়াতাড়ি মাদকের মতো আরাম দেয় তাই দরকার আমাদের, সে হোক অন্যরকম বন্য কিছু। তাই হয়ত নিজেকে খোঁজার, নিজেকে বোঝার সময় দিলেন ধরিত্রী মাতা স্বয়ং। না Viral কিছু নয় এক Virus - এর কারণে আজ দস্তুর মতো ভয়ার্ত আমরা, বন্দী আমরা। সকর্মক কিছু নেই অকর্মকভাবে নিজেকে জানা-বোঝার ছুটি। আমাদের বদলের কি এভাবেই বদলা নেওয়া হল তবে। আত্মশুদ্ধির সাথে সাথে দিন গুলি — প্রার্থনা করি, সুস্থ হোক পৃথিবী; শুভসময় আসুক আমার, আপনার, সবার।

Those Days Are Gone

Antarleena Roy
M.A. English

I have to write something for the newspaper. The editor of that eminent newspaper has requested me to write for their "Puja patrika". But I can't. I want help from the muse to inspire me. Now I am eighty. I have seen various kinds of incidents in my life. Yet I can't write. Only past days memories comes to me.

When I was a child I lived with my parents, uncle-aunt, cousins and grandparents. I used to play with my cousins. My school friends and neighbouring friends also played with us. Often we went their house and they also came to our house. In puja vacation our relatives came to our house, their relatives come to their house and there took place a get together. We used to go picnic. In 'Bijaya Dashami' after 'thakur bisorjon' we did 'pronam' to our elders and they blessed us. They gave us home-made sweets. Those are not costly but they gave us those sweets heartily. This is more valuable to us. In Deepabali we lit our house with 'pradips' and candles. I have no sister. But in our neighbourhood I had five-six sisters. They came to our house in 'bhaiphonta' to celebrate.

But now those days are gone. I live in a two BHK flat in a highrise apartment. I am alone here. Idea of neighbourhood is vanished now. I go every morning to a nearby park where I meet some people of my age. But they are not happy. They live aloof from their son or daughter. Two of my friends will be sent to old age home. I can never meet with them. Little children are hardly seen to play in the afternoon. They are busy always with their coaching classes, swimming class, dance class etc. They don't come to us to give their 'pronams'. Even they dont' talk with us. I don't know what is the reason behind this. Now a days value education is a subject taught in school. Children are taught to respect elders, help others. But we were not taught this kind of subject in school. We learnt that automatically in our home. No, I am not going to be judgemental. But I think it's a property of age to criticize young people. So I am sinking into past days memories and this recollection gives me pleasure in my isolated life.

A Few leaves from the Personal Diary of Liku-24

Sohini Roy
English

Today I woke up early in the morning. As usual after preparing Staphulic Energy Drink I was jogging Limo-27 to make him awakened. But suddenly darkness overwhelmed the sky. It was all about 6 A.M. by the watch. Today Limo-27 is going to Ustatus92 for his official work. It's a secondary planet of Cufic. Limo-27 had his AbdulKalam902 at 8:00 A.M. So, I went with him to see him off. Now I'm feeling a bit forlorn. Although I reminded him again and again to call me in Epitha to inform about his safe landing. Now I'm in my vacation and going to utilize this time by reading an ancient book. Though now a days it's needless as you can get easily anything in Introsat (improved and faster version of earlier internet) but being nostalgic I try to keep reading books. Today I became completely gassed at the very moment the line draw my whole attention in news channel. It was written that our Earth has another asteroid just like our Moon and they have declared it as Moon2. But no one had any idea about it even just two days back. Now a days things are happening haphazardly. Few years ago season has stopped changing after a huge earthquake. It has made our lives sticked. Though we are trying to make the situation easy but outcomes are not pleasing. Yesterday my parents came in Epitha. Epitha is a part of brain though not created by naturally but artificially to recall someone quickly as you sweet will. Even you can see clearly what they are doing, what they are saying just as you are talking with them face to face. Though to add Epitha in one's brain one has to go through a little operation. Generally people add it just after birth. In present day it's almost compulsory as those basic vaccines are. Today I have to go to buy all those ingredients of VisolissaA as its' bottle is going to be empty. It's a kind of anti-gravity gel that helps us adrift in air. By using it one's body becomes so light just like birds as it instantly increases alveoli(air bags) and you can go anywhere according to your will. By the way, the reference of birds reminds me about my work. Actually now I have been researching on Birds, a kind of archeological creature who could fly very easily without using Visolissa gel. I have been trying to bring back those creatures on earth again. In this purpose I also collected some of their fossils. Hischo

Bird Form provided me some records about Bird. Even I listened their recording tunes in the institution. There were various types of birds, for instance—Cuckoo, Wagtail, Nightingale and so on,I'm not able to remember more right now. Hischo Bird Form is a kind of museum only for birds, I should say an institution for researching on Bird. As I got membership card to join in the research(except the museum common people are not allowed there,especially in the main building). I observed their mummies ,read so many books to gather rear information. Often I become astonished when I read about those creatures. Today to maintain our super fast lifestyle we buy patents to get the formulas of tthose gels. But once think about them! They were able to fly in the sky naturally, what a creation of God! Even today we are going to oblivion to the existence of the real superpower in this Robotic World full of artificiality. Really now a days life is so fast that one can't go anywhere without using Visolissa. Different types of Visolissa are there according to their speed like – Visolissa A, Visolissa B, Visolissa C few days back I got to know they launched also Visolissa D. I don't have the last one as its' price is too high. Using Visolissa D one can go to Moon1 only within 4 hours. Now I have to involve myself in my research again. Besides, I booked a flat in Vigusat. It's a planet of Mutocalis, out of our solar system. Ok now bye, I have to make the booking confirm.

A Mother's Will

Sudipta Pramanik
English, 1st Year

The name of the village was Haripur. In this village Raicharan lived with his wife, Laxmi and child Gopinath. He used to earn money by tuition from house to house in that village. Raicharan and his wife Laxmi, were very happy with their son Gopinath. Because Gopinath was very good looking and was also very good in study. The couple wanted their son to study barrister. But the goddess of fortune may not have been helpful of them. Suddenly Raicharan died of a heart attack. Through five years, after the death of her husband Laxmi used to work tirelessly to teach her child for study. Laxmi had to work in peoples home because of poverty, as they did not have enough land. But Laxmi never let her child understand the poverty of her family. She always encouraged her child to study well. Laxmi never cared to her own health. All money what she earned by hard working at a mens house she spent on her child's education and deeding her child well. Laxmi wanted her son to study in the city, but she needed much and more money for this. So, she borrowed money from the village superintendent. And finally after being well educated in higher educaton, Gopinath got a chance to study barrister in the city. Laxmi was very hapy to hear this good news. Thinking that matter Gopinath will go to the city. Laxmi sold her husband's last memory, that was their remaining land. She thought thet with this money which she would get by selling the land, she would repay the loan of the money lender, and she and her son would go to town with the rest of the money. But the amount of money was so few that her prospect to going to city was crushed. So, she paid the half loan of the money lender and gave the rest of the money to his son so that he would have not to face any difficulty after going to town. Finally the day to go city.

On the day of going to the town of Gopinath, Laxmi was very sorry because she would have to be stay alone without her son. She kept saying again and again "The next time when you will come will you take me to town son ?" However, after going to town Gopinath's attitude changed. On one hand Laxmi worked tirelessly in the village and sent money to her son in the town. On the other hand, Gopinath started living in luxury in the town.

Two years passed, Gopinath did not go to his mother in he village as he got habitude to the city life. Meanwhile, in the village Laxmis distression situation also God started laughing. Because Laxmi's body was tied to the 'Tuberculosis'. But she did not want her son to worry about it, so she did not inform her son to worry about her sidease. In this way, after a few days Laxmi also died after falling into a crud smile of fate. The people of the village sent a letter to Gopinath about the death of hos mother, but it was not time for Gopinath to see the letter. Gopinath never used to dare to study. So, he hot a job as a lawyer in the towns prestigious court because of his good studies. Gopinath got everything but falling under the wheels of the towns' luxuries life, he denied his mother's sacrifice. However, he began to fell sorry for hos mother and However. he began to fell sorry for his mother and the absence of his mother began to affect him more and more. It was a stormy rainy day and he ready to go to his mother. Passing a long way, he reached his village home at about midnight. He was very hungry because he was exposed all day. He thought that his mother might not have any food for his because she didn't know that he was coming to village. He saw that all the house in village were dark and they had closed the doors and windows' of their house for the rain. He came in fornt of his house and saw his house lit up and his mother was sitting in the courtyard. He was surprised to see awake his mother at midnight and then he came near to her and apolized. He asked her how she realized that her son was coming to her. In reply she said, "A mother know everything about her child." Anyway he went into room and he ate dinner. Gopinath woke up at next morning and looked for his mother all around the house. But his attempt was futile. At that time people in the village were very surprised to see him and become angry because he did not come to his mother at the time of his mother's death. They told to Gopinath that it was vain to find his mother. Because his mother had been died for a long time ago. And they also told that the letter was sent about his mother's death but he did not reply. Gopinath then realized the biggest mistake of his life, and that was to deny his mother's love. He was saddened to learn of this difficult fact. He was looking dark in his eyes then. And the only thing or sound which was repeatedly in his ear's was "Son ! will you take to me to town ?"

Those Days are Gone

Antarleena Roy
English

I have to write something for the newspaper. The editor of that eminent newspaper has requested me to write something for their puja patrika. But I can't. I want help from the muse to inspire me. I am eighty now. I have seen various kinds of incidents in my life. Yet I can't write. Only past days memories are coming to me.

I lived with my parents, uncle, aunt, cousins and grandparents in my childhood. I used to play with my cousins. My school friends and neighbouring friends also played with us. We went their home and they also came our home often. In puja vacation our relatives came our home or we went their home. There took place a get together. We went picnic. In Bijaya Dashami after thakur bisorjon we did pronam our elders and they blessed us. They gave us home-made sweets. Those sweets were not costly but they gave us those sweets heartily. This is more valuable to us. In Deepabali we lit our house with pradips and candles. I have no sister. But in our neighbourhood I had five-six sisters. They used to come our home on the day of bhaiphonta to celebrate that occasion.

But now those days are gone. I live in a two BHK flat in a high-rise apartment. I am alone here. Idea of neighbourhood is vanished now. I go every morning to a nearby park where I meet some people of my age. But they are not happy. They live aloof from their sons and daughters. Two of my friends will be sent to old age home. I can never meet them again. Little children are hardly seen to play in the afternoon. They are busy always with their coaching classes, swimming class, dancing class, etc., etc. They don't come to us to give their pronam. Even they don't talk with us. I don't know what is the reason behind this. Nowadays value education is a subject taught in school. Children are taught to respect elder people, to help others. But we were not taught this kind of subject in school. We learnt that automatically in our home. No, I'm not going to be judgemental. But I think it's a property of age to criticize young generation. So, I am sinking into past days memories and this recollection gives me pleasure in my isolated life.

জোনাকি

তনুশ্রী মিস্ত্রি
(ভূগোল বিভাগ, প্রথম বর্ষ)

জান আমি কে?
ধর আমায়, চেন আমায়
কখনও বন্ধ করো না আমায় !!!
আমি উড়তে চাই, আমি
তোমাদেরকে পথ দেখাতে চাই সন্ধ্যায়।

আমি থাকি তোমার যাত্রা পথের
রেল ষ্টেশনের ধারে, থাকি
তোমার বাড়ির পাশের বাঁশ-তাল বাগানের
মাথার ওপরে।

জ্বলি আমি মিটমিট করে
তাকিয়ে থাক তুমি আমার দিকে
একদৃষ্টে .....।
ভয় লাগে! তুমি বোধ হয় আমাকে ধরতে চাও
কিংবা
তুমি হয়তো চাও আমার মতো জ্বলতে

উড়তে, সন্ধ্যার আলোয় ঘুরে বেড়াতে ....
আমি চাই তোমার সেই একাকিত্বের
বন্ধু হতে,
যাকে তুমি খুঁজে পেতে চাও নির্জন রাস্তায়
আমি তোমার সেই বন্ধু।

—— ✧✧ ——

থেকে যাবি কথা ছিল

মনীষা মণ্ডল
(সমাজবিদ্যা বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ)

আমার জন্ম তোর হাতে
আমার মরণ তোর ঘাটে,
আমি চলি ঘুরেফিরে
আমার ভাবনা ভবঘুরে।

আমার গৃহ তোর মনে
আমার অন্ন তোর গানে,
আমি তোর সুরেই চলি
আমি পথভুল করি তোর ছন্দ ভুল হলে।

আমি তোর খেয়া ঘাটের মাঝি
তোর সুরে গান বাঁধি,
দিন শেষ হলে তোর কথা ভেসে আসে
থেকে যাবি গান শেষ হলে।

—— ✧✧ ——

দুর্গা কেন ধর্ষিতা

পিয়ালী রায়
(দর্শন বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ)

দুর্গা আমার লাঞ্ছিতা আজ, দুর্গা আমার নির্যাতিতা।
দুর্গা আমার মৌন কেন আজ? দুর্গা কেন ধর্ষিতা?

দুর্গা কেন ঘরের কোনে একলা বসে কাঁদে!
স্বাধীন ভাবে চলতে কেন আজও দুর্গার বাঁধে?

মাতৃগর্ভে দুর্গার কেন নিরবাক্যে ঘটছে সমাপ্তি?
দুর্গাকে তারা অপমান করে প্রতিমাকে করে আরতি।।

দুর্গা কেন ভোগের সামগ্রী? সে কেন আজ পতিতা?
দুর্গা আমার নিথর কেন আজ? দূর্গা কেন ধর্ষিতা?

—— ✧✧ ——

ফিরতে চাই

ইপ্সা সরখেল
(বাংলা বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ)

রাত্রি জুড়ে অজানা ভয়ের
হাতছানি পেরিয়ে এসেছি
পেরিয়ে এসেছি দুরন্ত আশঙ্কার
ঘাত-প্রতিঘাত
সমস্ত দুঃশ্চিন্তা সমস্ত স্মৃতি
তলিয়ে গিয়েছে গভীরে
আরও গভীরে .....
বিষে বিষাক্ত শরীর ঝলসে গেছে
নীল আলোয়
তবু স্বপ্ন দেখা বাকি রয়ে গেছে
ফিরে দেখা বাকি রয়ে গেছে
বাকি রয়েছে ফিরে পাওয়া সময়।

—— ✧✧ ——

আমার শহর

সৃজিতা ঘোষ হাজরা
(কম্পিউটার বিভাগ, প্রথম বর্ষ)

আমাদের শহর এক আজব শহর, আছে নানা মত, নানা ভাষা
ন্যায়-অন্যায় আর সুখ-দুঃখ মিলেমিশে এই শহরেই আমাদের বাসা।
এই শহরের মধ্যে আছে নানান গলি আঁকা-বাঁকা,
দিন থেকে রাত্রি পর্যন্ত কারখানাতে ঘোরে কলের চাকা।

ইচ্ছে হলে দুপুরে যায় সুন্দর আকাশটাকে দেখা,
ভিড়ের মধ্যে দুপুরে যায় না এই শহরে পা রাখা।
রাতের শহরে ছুটছে গাড়ি একশো কিমি বেগে,
আমাদের শহর দেখছে এসব সারারাত্রি জেগে।

নৈশ ক্লাব, রঙিন আলো আর রঙিন জলের নেশা,
এইসব খেয়ে কারোরই পাওয়া যায় না কোনো দিশা।
অন্যদিকে ভিখারি ক্ষুধার্ত, অপেক্ষারত দুমুঠো ভাতের আশায়,
রাত্রি হয়েছে কিন্তু খালি সে যেতে পারছে না নিদ্রায়।

পাশের ডাস্টবিনের খাবার খেতে হবে লড়াই করে কুকুরের সাথে,
শীর্ন শরীর, কিছুটা রক্ত ঝরিয়ে এক গ্রাস ভাত উঠে এলো মুখে।
ভিতরের গলিতে, রাত্রে খাবারের আশায় ক্ষুধার্ত থাকে কুকুরের দল,
আভিজাত্যের অহংকারে, দাঁড়িয়ে একাকী শীততাপ নিয়ন্ত্রিত শপিং মল।

শহর মানে গভীর রাতে একলা মেয়ের বিকিয়ে যাওয়া,
টারা নোট সঙ্গে করে হাজারো স্বপ্ন নিয়ে বাঁচতে চাওয়া।
ঝড়ে যাওয়া পাতার নীচে সযত্নে রেখেছি কত শোক,
এই শহর ছেড়ে দূরে যেতে হবে ভাবলেই কান্নায় ভেজে দুই চোখ।

——— ✧✧ ———

আমাদের কলেজ

সৃজিতা ঘোষ হাজরা
(কম্পিউটার বিভাগ, প্রথম বর্ষ)

মুর্শিদাবাদ অবস্থিত স্বনামধন্য ঐতিহ্যবাহী বহরমপুর গার্লস কলেজ,
আমাদের সকলকে সাহায্য করছে বাড়াতে পড়াশোনা বিষয়ে নলেজ।
সব প্রাক্তন ছাত্রী ভালো রেজাল্ট করে কলেজের মুখ উজ্জ্বল করেছে,
প্রাক্তন পড়ুয়াদের সবাই আমাদের এই কলেজকে মাথায় করে রেখেছে।

রাজনীতি বিহীন শান্ত, স্নিগ্ধ, আলোকজ্জ্বল, সবুজে ঘেরা এই কলেজের পরিবেশ,
এরই মাঝে প্রতিদিন কলেজে গিয়ে পড়াশোনা আর আনন্দ দুটোই করি বেশ।
এত ভালো স্যার, ম্যামদের পেয়ে আমরা সত্যি নিজেদের মনে করি ভাগ্যবান,
কলেজের উন্নতির পেছনে কোনোদিনই অস্বীকার করা যাবে না তাঁদের অবদান।

মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন প্রান্ত এমনকি অন্য জেলা থেকেও ছাত্রীরা আসে পড়তে,
কলেজের পাশেই আছে হোস্টেল, ছাত্রীদের কাছে থেকে পড়াশোনার সুবিধার্থে।
হাতেকলমে শেখার জন্য আছে উন্নত যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার সঙ্গে পরীক্ষাগার,
আমাদের কলেজ সৌন্দর্য্য আর পরিকাঠামো সবদিক থেকেই চমৎকার।

সবশেষে কলেজের প্রতিষ্ঠাতার জন্য জানাই আমার প্রণাম,
সবটুকুই প্রাপ্য তাঁর এই কলেজের জেলাভরা সুনাম।

বহরমপুর গার্লস কলেজ

অনন্যা কাণ্ডারী
(বাংলা বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ)

বহরমপুর গার্লস কলেজ মানে
একটু শাসন, একটু নিয়ম
আর অনেকটা ভালোবাসা
স্যার, ম্যামদের আদেশ উপদেশ
সঙ্গে আশা-ভরসা
এতো প্রোগ্রাম, বিশেষ দিনে শাড়ি পরা
সরস্বতী পূজোর অঞ্জলি,
আর ওদিকে ক্যান্টিনে
খাওয়ার থেকে এক প্লেট চাউমিনে আড্ডা বেশি
তবে এসবের মাঝে একটা সেলফি মাষ্ট
না হলে ঠিক জমে না যাস্ট।
বহরমপুর গার্লস কলেজ মানেই
প্রতিটি ছাত্রীর ইমোশন
স্যার, ম্যামদের অনুপ্রেরণা ও আর্শিবাদ
সায়েন্স বিল্ডিং-এ কেমিষ্ট্রি ল্যাবের হইচই
লাইব্রেরির নিস্তব্ধতা, সেমিষ্টারের প্রিপারেশন
আর রেজাল্টের চাপা টেনশন।
বহরমপুর গার্লস কলেজ মানেই
নম্রতা-ভদ্রতা, সংস্কৃতি-ঐতিহ্য
চলেনা ওসব জিন্স- -শার্ট
রোজ একবার নোটিশ বোর্ডে চোখ বুলিয়ে
ছুটির শেষে খেতেই হবে
দই-ফুচকা আর পাপড়িচাট।
হাজার বছর থাকুক বেঁচে
ভালোবাসার অটুট বন্ধন, বন্ধুত্বের খুনসুটি
থাকুক বন্দি মোবাইলের গ্যালারি
ক্যন্টিনে কেড়েকুড়ে খাবার খাওয়া,
ফ্রেসারসদের সেই নাচ
স্বাক্ষী থাকুক ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম স্টোরি।
এসব যখন হবে অতীত কলেজ পাশে যাবে হেঁটে
স্মৃতি সব পড়বে ঝরে দেখবে সবার চোখের কোণে
মনে রেখো বন্ধু তুমি রাখবো মনে আমিও
হাজার বন্ধুর হাত ধরে পার করা কত স্টেজ,
থাকবে মনন হৃদয়ে বহরমপুর গার্লস কলেজ।

আমার ইচ্ছে

রায়শা মুখার্জ্জী
(কমিউনিকেটিভ ইংলিশ, তৃতীয় বর্ষ)

ও আমার আকাশ ভাই
আয়না আমার কাছে —
নিয়ে যানা তোর দেশে।।

ইচ্ছে করে উড়ব আমি
তোর বুকেতে পক্ষীরাজ হয়ে।
কখনো বা সূর্য্যি কিংবা
চাঁদ মামা হয়ে,
খেলব লুকোচুরি মেঘের সাথে।।

ইচ্ছে হলেই ঝড় হয়ে,
করব শাসন —
সারা পৃথিবী জুড়ে,
অমনি তখন বৃষ্টি হয়ে
সবার মন ভরিয়ে দেব,
আনন্দ আর শান্তিতে।।

ও আমার আকাশ ভাই —
আয় ছুটে আয়
একবারটি নিয়ে যা তোর দেশে।

——✧✧——

ছাত্র শক্তি

সুস্মিতা মণ্ডল
(দর্শন বিভাগ)

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ গেল
এবার এলো শীত
গাছ গাছালির ঝড়ছে পাতা
মিষ্টি রোদের গীত
সূর্য এখন অনেক দূরে —
তেজটাও বেশ কম
দুপুর বেলায় লুচির সাথে
জমবে আলুর দম।
নদীর ধারে চড়ুইভাতি।
দারুণ রকম মজা।
রোদ মাখিয়ে মনের স্বাদে
ভেলপুরি আর গজা।
পিঠে-পুলির গল্পটা বেশ
নতুন গুড়ের দানা
শীত আসছে ঠাণ্ডা নিয়ে
আনন্দে নেই মানা
গরম জামা কিংবা চাদর
এই সব নেই যাদের
ফুট-পাথেতে সারা রাত্তির
কষ্ট শুধুই তাদের।
এদের ব্যথা ভাঙবে যারা
তারাই দেশের বল।
সত্যিকারের শক্তি তারাই
তারাই ছাত্র-দল।

——✧✧——

মা

রায়শা মুখার্জ্জী
(কমিউনিকেটিভ ইংলিশ, তৃতীয় বর্ষ)

বক্ষ জুড়ে দিয়েছে আমায় স্থান
সবার কখনো করেছ গভীর অভিমান।
তুমি আমার শক্তি
তোমারে করি ভক্তি।
সদাই থেকো পাশে আমার সুখে
থেকো মোর দুখে।
তোমার স্পর্শে আমার জীবন হয় ধন্য
মিষ্টি হাসিতে আমার হৃদয় হয় পূর্ণ।

রয়েছি আমি তোমার স্নেহে
থাকব আমি তোমার মনে।
যে পথেই যাই
সেখানে তোমাকেই খুঁজে পাই।
বলে দাও আমায়
কেমনে করি তোমার ঋণ শোধ?
মোর জীবনে তোমা ছাড়া
আর কেই নাই —
ওগো তুমি আমার জননী, জন্মদাত্রী মা।।

——✧✧——

পাহাড়

অধ্যাপক বিনয় ডাঙ্গর
(ইংরাজী বিভাগ)

তুমি যদি চোখ খুলে দেখো শুধু
ভাবো না কিছুই
এ কর্তব্য বড় দায়।

বেঁচে আছো অনেক উজান বেয়ে।
তবে উজানেরও ভালো কিছু থাকে,
কষ্টদৃশ্য বৃথা হয়ে যায় না কখনো,
দ্রষ্টব্য হয়ে থাকে বহুদিন ধরে।

এই যে পাহাড় থেকে নেমে আসে আলো,
ঝোরা দিয়ে বয়ে যায় জল;
বরফের সূক্ষ কণা মনের মতো জমে,
কখনো ফুলের রঙ হেসে উঠে
প্রতিটি ভাঁজের বাঁকে,
তুমি দেখো শুধু,
ভাবো না কিছুই।

খিদে এসে ছাঁকে বুঝি সব ভাবনা!

অতিথিরা এসে যবে বাতাস ভারী করে,
এ দৃশ্য লুট করে নিয়ে যায়,
যদিও তা কখনো সত্যি নয়,
তখনও
তোমার চিকন চোখ সরে না খিদের থেকে দূরে।

——✧✧——

From a Love-worshipper

Prakriti Laxmi Singha
English Department

In an undersined way
once, you became my desire;
Never I could feel you, find you,
touch you in my desirable pain.

Hence I wish you to be with me
in my joys, in my solace I hire;
Did you feel it ever why
they don't count on me as your lover !

Cause that wishing to be a lover.
accomplishing myself an worshipper,
made me different from lover;
what I wanter to be never.

For the forst time a failure I think,
Given the book of yearn a touch of ink.

——✧✧——

My Verses

Kathika Bagchi
English Department

I could not write the syllables,
Words were there,
And a canvass too
Even I had a flair.
Emotions gushed out, alike a storm,
But I could not write the syllables;
And, my verses laid still, a remote death.
I had a rose for me,
Lots of papers too, enveloped,
Love did hover through the clouds;
A revolution within me; formant
But I could not weave the words,
Lifeless prose rushed around.
O could not give life to t he words,
So, my verse laid still, a remote death.
Despair and love were collaged
A warm touch was present,
I, a very tiny existance, did fail to worship,
I could only adore.
I am a poet,
I didn't give birth to poetry.

——✧✧——

The sky is Blue

Kathika Bagchi
English Department

She was a very pretty girl,
Standing alone on the moonlit shore -
Counting the stars, far away,
Unware what's for her on that wery day.

She was pretty, her name was Diana
Her golden locks were vibrant, like Medusa's,
He red lips, trembled, like dew fresh petals,
She was pretty indeed.

No, Endymion didn't come for her that night,
Nut came her ineviyable fate.
She was unaware of her future plight
Plight, that was Death.

A hound of beasts fell upon her
Her snow white dress' ripped apart
Her little body laid still
Amidst dust, sweat and blood.

Candle marches, riots, appeals went on,
The everything subsided one day
A pure bud of the garden was torn,
World has lost her flower but pricked by the thorn.

Thorn of conscience, that the world could not ignore -
Justice was delivered, pledges were made
The word is echoing together today,
"Our sky will again be blue someday"!

রাতের ফিঙে

সামিমা খাতুন
(ইংলিশ বিভাগ, বর্ষ)

সুখাময় বৈচিত্রের ঝলসানো অন্ধকারে শহর, নগর গ্রাম যখন তাদের অন্তর্বাস পাল্টায়,
তারই মাঝে ল্যাম্পপোস্টের হাড়হিম রুগ্ন বাহুতে,
প্রতিঘাত অবসর পার করে এক ঐশ্বরিক ফিঙে,
তার শরীরময় এক দুরভাস-এর চাঁদর বিস্তৃত হয়,
অস্ফুট আর্তভেদি ছিন্নমস্তর এক গহ্বর তার ক্লান্তহীনতার খবর পাই।

তার পরেই এক টুকরো জ্যোতি ফুলের মতন স্নেহময় চিহ্ন
নিশেন ওড়াই সভ্যতার মধ্যগগনে
ক্ষত চিহ্ন বয়ে বেড়ানো শহরের এক ভূমিকম্পে তার বাসস্থানের উর্বরতা হাওয়াই দোল খায়,
স্মৃতিপটের সবুজ অফুরন্ত দিকবিদিক আলোর গোত্রহীন রঙমশালের তির্যক ভালোবাসা
রাতের মেঘপুঞ্জে হারিয়ে যাওয়া ফিঙেও পেয়েছিল একদিন।

সেও একদিন তার মেনিয়া হৃদয়ে এক ভালোবাসার স্বরবর্ণ এঁকেছিল,
যেমনটি ধরিত্রীর পূর্ণ অবকাশ হৃদয়ের দোদুল্যে বসন্ত রাগ ছড়ায়,
আজ সরীসৃপ এর চোখের মতো অন্ধকার বিশ্বলোক রাত্রিকে
প্রশ্ন করে একরত্তি গাঢ় অলৌকিক চাঁদ,
কী প্রশ্ন করে?

তার উত্তর ভরাকটালের স্মৃতিকে রোমন্থন করে,
ফিঙের নেশাগ্রস্ত ব্যথা কী তীব্রতায় হানাহানি করে শেষ হয়ে যাওয়া চাঁদের পশ্চাতে,
যেমনটি এক প্রেমিক শ্লাঘার জলে হাবুডুবু খায়
যখন তার রমণী মোচ্ছব করা এক সংস্পর্শে রন্ধন প্রক্রিয়ায় ধোয়া ছড়ায়।

আজ হঠাতই নিয়নের ধিকধিক করা আলোয় ফিঙের চোখ অন্ধতায় ভেসে যায়,
তাকে থাকতে হবে অতিবৃষ্টির জঙ্গলে কীট গোষ্ঠীর সঙ্গোপনে
নগরের যৌবন অরণ্যে,
রাতের আয়োজনে অভিজ্ঞ চাঁদকেও প্রস্তুতি নিতে হয়
মেঘের ভেলায় বৈতরণী পার হবার আশায়।

পৃথিবী অবসরে মাতাল হতে চলে গেলে,
ফিঙের হৃৎপিণ্ডের তেজস্ক্রিয়তার চিরাচরিত শিল্পীরা সংসার বুনে,
ফিঙের প্রতিপত্তির চাদরে আগুন লাগলে
যৌনতার পক্ষপাতিত্তরা ডুবসাঁতারের নীড়ে বেড়াজাল আঁকে।
তখন কয়েক লক্ষ চোখ নিয়ে এই দক্ষ যজ্ঞের পৃথিবী
সন্ধি বিচ্ছেদ করে যথেচ্ছাচারের নির্লোভ চরাচরে।

——✧✧——

আয়োডিনের উপযোগিতা

ডঃ স্মৃতিরতন ত্রিপাঠী
অধ্যাপক, বহরমপুর গার্লস কলেজ

দেহের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য আয়োডিন একটি অপরিহার্য উপাদান। মানুষের দেহে আয়োডিনের অতি সামান্য পরিমাণে (১৫-২০ মিগ্রা) উপস্থিত থাকে। স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় কাজের জন্য প্রতিদিন প্রায় ১০০-১৫০ মাইক্রোগ্রাম (০.১-০.১৫ মিগ্রা) আয়োডিন প্রয়োজন হয়। অতি স্বল্প মাত্রায় প্রয়োজনীয়তার জন্য একে ট্রেস এলিমেন্ট্ (trace element) বলে।

উৎস

শরীরে আয়োডিন প্রবেশ করে খাদ্য ও পানীয় জলের মাধ্যমে। খাদ্যে আয়োডিন আসে খনিজ লবনের মাধ্যমে। অর্থাৎ মাটি থেকে শাক-সব্জিতে আয়োডিন প্রবেশ করে। আবার তৃণভোজী প্রাণীদের শরীরেও আয়োডন আসে শাক-সব্জির মাধ্যমে। আর শাক-সব্জি, মাংস, ডিম, মাছ বিশেষ করে সামুদ্রিক মাছের মাধ্যমে আমাদের শরীরে আয়োডিনের যোগান ঘটে। সমুদ্রের জলে প্রচুর পরিমাণে আয়োডিন আছে। সমুদ্রের জল থেকে আয়োডিন বাষ্পীভবনের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে শোষিত হয় এবং এই আয়োডিন বরফ ও বৃষ্টির মাধ্যমে পাহাড়ে ফিরে আসে। পাহাড় থেকে এই আয়োডিন নদীর মাধ্যমে মালভূমি এবং পরে সমতল অঞ্চল এবং সেখান থেকে শেষে পুনরায় সমুদ্রে প্রবেশ করে। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, তুষারস্রোত এবং বন্যার ফলে আয়োডিন দ্রুত হ্রাস পায়। তাই এই সব অঞ্চলের মাটিতে আয়োডিন হ্রাস বা লোপ পাওয়ায় ঐ অঞ্চলের বসবাসকারী মানুষের খাদ্যে আয়োডিনের অভাব দেখা যায়। পানীয় জলে আয়োডিনের পরিমাণ নির্ণয় করে মাটিতে আয়োডিনের পরিমাণ অনুমান করা সম্ভব। সাধারণত আয়োডিনের অভাবজনিত স্থানে প্রতি লিটার জলে
আয়োডিনের পরিমাণ ২ মাইক্রোগ্রাম। অপর দিকে স্বাভাবিক আয়োডিন যুক্ত স্থানে প্রতি লিটার পানীয় জলে আয়োডিনের পরিমাণ ৯ মাইক্রোগ্রাম। সামুদ্রিক মাছে আয়োডিনের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত হলেও অন্যান্য মাছ, মাংস এবং ডিমেও যথেষ্ট পরিমাণ আয়োডিন পাওয়া যায়। ভেজিটেবল্ খাদ্যগুলির মধ্যে সব্জির চেয়ে শাকজাতীয় খাদ্যে আয়োডিন বেশি পরিমাণে থাকে।

প্রয়োজনীয়তা

প্রাপ্ত বয়স্কদের দৈনিক ১০০ থেকে ১৫০ মাইক্রোগ্রাম আয়োডিন লাগে। গর্ভাবস্থায় এবং স্তনদাত্রী মায়ের ক্ষেত্রে এই আয়োডিনের দৈনিক চাহিদা বেড়ে হয় যথাক্রমে ১৭৫ ও ২০০ মাইক্রোগ্রাম। শিশুদের ক্ষেত্রে আয়োডিনের দৈনিক চাহিদা আনুপাতিক হারে কম।

	বিভাগ	দৈনীক প্রয়োজনীয়তা মাইক্রোগ্রামে
১।	নবজাত শিশু	
	(ক) ৬ মাস পর্যন্ত	৪০
	(খ) ৬-১২ মাস পর্যন্ত	৫০
২।	শিশু	
	(ক) ১ - ৩ বৎসর	৭০
	(খ) ৪ - ৬ বৎসর	৯০
	(গ) ৭ - ১০ বৎসর	১২০
৩।	প্রাপ্ত বয়স্ক	১৫০
৪।	গর্ভবতী নারী	১৭৫
৫।	স্তননদাত্রী মাতা	২০০

আয়োডিনের বিপাক

সুস্থ স্বাভাবিক দেহে মোট আয়োডিনের (১৫-২০ মিগ্রা.) প্রায় ৭০-৮০ শতাংশ থাইরয়েড গ্রন্থিতে উপস্থিত থাকে। থাইরয়েড গ্রন্থির ওজন প্রায় ১৫-২০ গ্রাম। খাদ্যে উপস্থিত আয়োডাইড্ অতি সহজেই খাদ্য নালির মাধ্যমে শোষিত হয়। প্রতিদিন গৃহীত আয়োডিনের ৯০ শতাংশেরও বেশি মূত্রের মাধ্যমে নির্গত হয়। প্রতি ১০০ মিলি. মূত্রে আয়োডিনের পরিমাণ ১০ মাইক্রোগ্রামের কম হলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ঐ ব্যক্তির খাদ্যে আয়োডিনের উপস্থিতি স্বাভাবিক অপেক্ষা কম। দেহের প্রয়োজনের জন্য থাইরয়েড গ্রন্থি বিশেষ সক্রিয় পদ্ধতিতে রক্ত থেকে প্রতিদিন প্রায় ৬০ মাইক্রোগ্রাম আয়োডিন গ্রহণ করে। খাদ্যে আয়োডিনের ঘাটতি দেখা দিলে থাইরয়েড গ্রন্থির আয়োডিন ক্ষমতা অধিকতর সক্রিয় হয়। থাইরয়েড গ্রন্থিতে আয়োডিন অজৈব আয়োডিন রূপে অথবা অ্যামিনো অ্যাসিডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মনোঅয়োডোটাইরোসিন (MIT), ডাই আয়োডোটাইরোসিন (DIT), ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন (T_3) অথবা থাইরক্সিন (T_4) রূপে উপস্থিত থাকে। এছাড়াও আয়োডিন থাইরয়েড গ্রন্থির কোলয়েডে-এ উপস্থিত থাইরোগ্লোবিন প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়েও থাকে। রক্তে আয়োডিন থাইরক্সিন (T_4), T_3 এবং অজৈব আয়োডিন রূপে উপস্থিত থাকে। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে হরমোনগুলির নিঃসরণ পিটুইটারি গ্রন্থি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

থাইরয়েড

থাইরয়েড একটি গুরুত্বপূর্ণ অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলো থেকে নিঃসৃত জটিল জৈব রাসায়নিক পদার্থকে বলে 'হরমোন'। 'হরমোন' শব্দটি ইংরেজি। এসেছে গ্রীক শব্দ হরমেইন থেকে। যার অর্থ জাগ্রত করা। এই হরমোনগুলি আমাদের শরীরের ভিতর প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন জৈব পক্রিয়াগুলোর ভেতর সমন্বয় ঘটানোর সাথে সাথেই আমাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। খুব সামান্য

পরিমাণ হরমোন যেমন শরীরে অনেক কাজ করতে পারে, তেমনি নিঃসরণের মাত্রা বেড়ে বা কমে গেলেও বিপত্তি ঘটে। দেখা দেয় বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক গোলোযোগ।

(Thyroid) । 'থাইরিঅয়েড' শব্দটির অর্থ শিল্ড বা বর্ম। গ্রন্থিটিকে দেখতে অনেকটা বর্মের মতো মনে হয় বলেই এরকম নামের উৎপত্তি বলে মনে করা যেতে পারে। থাইরয়েড গ্রন্থিটি ঘাড়ের সামনের দিকে স্বরথলির (ল্যারিংক্স) নীচের অংশে এবং শ্বাসনালির (ট্রাকিয়া) উপরের দিকে অবস্থিত। দেখতে অনেকটা প্রজাপতির মতো, ছোট্ট অংশ দিয়ে দুটি ডানার সঙ্গে যুক্ত। আয়তনেও খুবই ছোট। প্রতিটি ডানার মতো অংশ দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪ সেমি এবং প্রস্থে ১-২ সেমির মতো। গ্রন্থিটি আকারে বৃদ্ধি পেলে প্রজাপতির মতো দেখতে লাগে বলে পূর্বে মহিলাদের ক্ষেত্রে এটি সৌন্দর্যের প্রতীক রূপে চিহ্নিত করা হতো। নবজাগরণের যুগে চিত্রকলায় (বিশেষত মেডোনার চিত্রে) থাইরয়েডের বৃদ্ধি বা গলগণ্ড দেখা যায়। বর্তমানে এই গ্রন্থির বৃদ্ধি মারাত্মক ব্যধি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

মানব শরীরে T_3 ও T_4 এর ভূমিকা

- T_3 এবং T_4 হরমোন মূলত শরীরে বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে এবং মস্তিস্কের পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। এই হরমোনগুলি শর্করা জাতীয় খাদ্যকে শরীরের পক্ষে আরো ব্যবহারোপযোগী করে তোলে। এছাড়া প্রোটিন ও ফ্যাটের সংশ্লেষ ও ভাঙনে সাহায্য করে। দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে ও খাদ্য বস্তু অজীর্ণকরণের সময় এই হরমোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।
- থাইরয়েড হরমোন যকৃত, বৃক্ক ও পেশির বিপাক ক্রিয়া বৃদ্ধি করে অক্সিজেনের ব্যবহার বৃদ্ধি করে।
- ভ্রূণ থেকে ফিটাস অবস্থায় পৌঁছানোর পর মস্তিস্কের বিকাশ ঘটানো থাইরয়েড হরমোনের অন্যতম কাজ। এই সময় থাইরয়েড হরমোনের অভাব হলে বুদ্ধাঙ্ক (IQ) হ্রাস পায়।
- শৈশব অবস্থাতেও মস্তিস্কের বিকাশ ঘটানো থাইরয়েড হরমোনের কাজ।
- দেহের বিভিন্ন আন্তর্যন্ত্রের বৃদ্ধি, বিকাশ ও রূপান্তর, থাইরয়েড হরমোনের উল্লেখযোগ্য কাজ।
- এই হরমোন কোষের নিউক্লয়াসে বংশগতির ধারক ও বাহক 'জিন'-এ উদ্দীপনা দিয়ে নতুন প্রোটিন ও উৎসেচক সংশ্লেষণ করে ঐ সমস্ত কার্য সম্পন্ন করে।
- বয়ঃসন্ধিতে বালক এবং বালিকাদের শরীরে যথাক্রমে পুরুষালি ও মেয়েলি বৈশিষ্ট্যগুলোর ধীরে ধীরে প্রকাশ ঘটাতে শরীরে অন্যান্য হরমোনের সঙ্গে একত্রে T_3 ও T_4 হরমোনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

আয়োডিনের অভাব

যে সমস্ত অঞ্চলের মাটিতে আয়োডিনের পরিমাণ কম সেই সমস্ত অঞ্চলকে আয়োডিনের অভাবযুক্ত অঞ্চল বলা হয়। পৃথিবীর প্রায় ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ লোক আয়োডিনের অভাবযুক্ত অঞ্চলে বাস করেন।

পার্বত্য উপত্যকার মাটিতে আয়োডিনের পরিমাণ কম থাকে। আমাদের দেশের পার্বত্য উত্তর ভারত আয়োডিনের অভাবযুক্ত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত। ওই অঞ্চলটিকে 'হিমালয়ান্ গয়টার্ বেল্ট্' বলা হয়। এছাড়াও ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যের কোনো না কোনো অংশে আয়োডিনের অভাবযুক্ত অঞ্চল আছে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরদিকের অংশ অর্থাৎ সমগ্র উত্তরবঙ্গই আয়োডিনের অভাবযুক্ত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত। যদিও বর্তমানে কিছু সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে, পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলের একটি বৃহৎ অংশের মানুষ আয়োডিনের অভাবজনিত T_3 ও T_4 হরমোন ঠিক মতো নিঃসৃত হয় না। ফলে শরীরে বিভিন্ন ধরণের বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ পায়।

আয়োডিনের অভাবজনিত দুরবস্থা

আয়োডিনের অভাবে মাতৃগর্ভে অবস্থিত ভ্রূণে, নবজাত শিশুদেহে, শিশুদেহে, বয়ঃসন্ধিকালে এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের যে সমস্ত শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটে সেই পরিবর্তন সমূহকে এক কথায় আয়োডিনের অভাবজনিত দুরবস্থা (Iodine Deficiency DIsorders, IDD) বলা হয়। আয়োডিনের অভাবে মুখ্যত ভ্রূণে যে প্রভাব পড়ে তার ফলেই হাবা-গোবা বা স্থুলবুদ্ধি সম্পন্ন শিশুর জন্ম হয়। শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের আয়োডিনের অভাবে গয়টার বা গলগণ্ড রোগ দেখা দেয়। আয়োডিনের অভাবজনিত দুরবস্থাসমূহ নিম্নে দেওয়া হল।

- ভ্রূণ (মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে) - গর্ভপাত, মৃতসন্তান, মস্তিস্কের ক্ষতি।
- নবজাতক - সদ্যজাত গলগণ্ড, মস্তিস্কের ক্ষতি।
- শিশু - গলগণ্ড, থাইররয়েড, হরমোনের অভাবে শক্তির অপব্যয়, বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ব্যাহত, দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত।
- প্রাপ্ত বয়স্ক - গলগণ্ড ও আনুষঙ্গিক উপসর্গ, থাইরয়েড হরমোনের অভাবে শক্তির অপব্যয়, মানসিক কার্যাবলীর হ্রাস।

মানসিক ও দৈহিক অক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শ্রমক্ষমতার হ্রাস, চিকিৎসার জন্য ব্যয় ইত্যাদির ফল পারিবারিক ও সামাজিক অর্থনীতিতে প্রতিফলিত হয়। মানসিক ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠনের মান দুর্ভাগ্যজনক হয়।

আয়োডিনের অভাব নির্ণয়

কোনো অঞ্চলে আয়োডিনের অভাব আছে কিনা তা নির্ণয় করার জন্য 'এপিডেমিয়োলজিক্যাল্ অ্যাসেস্মেন্ট্ অব্ আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি' করা হয়। বেশ কিছু লক্ষণ দেখে কোনো অঞ্চলে আয়োডিনের অভাব আছে কিনা তা স্থির করা হয়। লক্ষণগুলি হল -

১) কোনো অঞ্চলে গটার এনডেমিক অর্থাৎ মহামারী কিনা দেখা হয়। অর্থাৎ ঐ অঞ্চলে শতকরা

কতজন লোকের গয়টার আছে তা খতিয়ে হয়। 'হু' কিংবা 'ইউনিসেফে'র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ৬ থেকে ১২ বৎসর পর্যন্ত শিশুদের গয়টারের শতকরা হার ৫-২০ হলে তুলনামূলক কম মহামারী, ২০-৩০ শতাংশের হলে মাঝারি মানের মহামারী এবং ৩০ শতাংশের বেশি হলে বিপদকালীন মহামারী হিসেবে ঐ অঞ্চলকে চিহ্নিত করা হয়।

২) কোনো শহর বা গ্রাম বেছে নিয়ে সেই অঞ্চলে ক্রেটিনিজমের (বামনত্বের) আধিক্য কতটা তা পরীক্ষা করা হয়। শিশুদের জন্ম থেকে আয়োডিনের অভাব হলে ক্রেটিনিজম্ দেখা যায়।

৩) মূত্রে আয়োডিনের পরিমাণ নির্ণ করা হয়। যেহেতু আয়োডিন গ্রহণের ৯০ শতাংশের চেয়েও বেশি পরিমাণ মূত্রের মাধ্যমে শরীর থেকে নির্গত হয়ে যায় তাই এই পরীক্ষার মাধ্যমে আযোডিন গ্রহণের মাত্রা জানা যায়।

৪) পানীয় জলে আয়োডিনের পরিমাণ নির্ধারণ করে।

৫) বিভিন্ন বয়সে রক্তে T_4 এর মাত্রা। বিশেষত নবজাত শিশুদের রক্তে T_4 এর পরিমাণ, কারণ T_4 প্রাথমিক পর্যায়ে মস্তিস্কের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য অপরিহার্য। আযোডিনের অভাবজনিত অঞ্চলে কনজেনিটাল হাইপোথাইরয়েডিজম্ রোগ বেশি দেখা যায়।

আয়োডিনের অভাব দূরীকরণ

আয়োডিনের অভাব দূর করতে সারা বিশ্বে বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কিছু কিছু উন্নত দেশগুলিতে দুধ, ডিম, পাউরুটি, মাংস ইত্যাদি খাদ্যে আয়োডিন মেশানো হয়। কোথাও কোথাও উদ্ভিজ তেলের সঙ্গে আয়োডিন মেশানোর ব্যবস্থা দেখা যায়। বহুল ব্যবহৃত আয়োডিনযুক্ত তেল হল 'লিপিওডল' (Lipiodol)। এই তেল পোস্ত থেকে উৎপন্ন হয়। আয়োডিনযুক্ত তেল ইন্‌জেক্‌শনের মাধ্যমে একবার প্রবেশ করালে গলগণ্ড রোগ প্রায় তিন বৎসর প্রতিহত রাখা সম্ভব। আয়োডিনযুক্ত তেল ইন্‌জেক্‌শনের মাধ্যমে দেহের মধ্যে প্রবেশ করানো অপেক্ষা মুখের মাধ্যমে গ্রহণ করানো সহজ। তবে মুখের মাধ্যমে প্রয়োগ করালে কার্যকারিতার সময় হ্রাস পায়, কারণ আয়োডিন পেশিতে সঞ্চিত হতে পারে না।

জলের মাধ্যমেও আয়োডিন বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রয়োগ করা সম্ভব। সব থেকে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি পটাসিয়াম আয়োডেট্ বা আয়োডাইড্-এর গাঢ় দ্রবণ পানীয় জল সঞ্চয়ের পাত্রে প্রয়োগ করা হয়। কোনও কোনও অঞ্চলে আয়োডিনের ট্যাবলেট্ সরাসরি খাওয়ানো হয় কিংবা খাদ্যের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়।

উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশগুলোতে আয়োডিন নুন বা লবনের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ানো হয়। লবনকে বেছে নেবার পিছনে দুটি যুক্তি কাজ করে - প্রথমত, লবন সবাই ব্যবহার করেন। দ্বিতীয়ত, লবনের মাদ্যমে অত্যন্ত কম খরচে ঘরে ঘরে আয়োডিন পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। প্রতিদিন একজন সাধারণ মানুষের ১০০-১৫০ মাইক্রোগ্রাম আয়োডিনের প্রয়োজন হয়। অপরদিকে প্রতিদিন গড়ে লবনের প্রয়োজন ১০-১৫ গ্রাম। লবন পরিবহনের সময় কিছুটা আয়োডিন লবন থেকে কমে যায়। লবনের বস্তা গুদামজাত করে রাখার সময়ও

কিছুটা আয়োডিনের মাত্রা কমে যায়। বাড়িতে দীর্ঘদিন লবন রেখে দিলেও আয়োডিনের মাত্রা কমে যায়। তাই তৈরি থেকে পৌঁছানোর সময় ধরে আয়োডিনের মাত্রা ৩০ পিপিএম বেঁধে দেওয়া হয়। যাতে করে ক্রেতার হাতে লবন পৌঁছাবার সময় ওই লবনে আয়োডিনের মাত্রা থাকে অন্তত ১৫ পিপিএম।

থাইরয়েড গ্রন্থির সমস্যা

থাইরয়েড গ্রন্থির যে সমস্ত সমস্যা দেখা যায় তা মূলত দু'ধরনের। প্রথমত, থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধিজনিত সমস্যা এবং দ্বিতীয়ত, থাইরয়েড গ্রন্থির হরমোন নিঃসরণজনিত সমস্যা। থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধিজনিত সমস্যাকে দুভাগে ভাগ করা যায় যথা - (১) সাধারণ গয়টার বা গলগণ্ড এবং (২) থাইরয়েড্ ক্যানসার। অপরদিকে হরমোন ক্ষরণ জনিত সমস্যাকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায় - যথা (১) হাইপোথাইরয়েডিজম বা কম থাইরয়েড হরমোন নিঃসরণজনিত সমস্যা এবং (২) হাইপারথাইরয়েডিজম বা বেশি থাইরয়েড হরমোন নিঃসরণজনিত সমস্যা। এই সমস্ত রোগের লক্ষণগুলো যেমন পৃথক তেমনি চিকিৎসাও পৃথক।

গয়টার বা গলগণ্ড

স্বাভাবিক মাত্রায় আয়োডিন গ্রহণ করলে থাইরয়েড গ্রন্থির আকৃতি ক্ষুদ্র থাকে এবং দেহের প্রয়োজন অনুসারে থাইরয়েড হরমোন সংশ্লেষিত হয়। এই অবস্থায় গ্রন্থির উপস্থিতি অনুভবযোগ্য নয় বা অনুভব করা শক্ত। যে অবস্থায় থাইরয়েড গ্রন্থির পার্শ্বীয় লোব বা লতির আয়তন ঐ ব্যাক্তির হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির বা অঙ্গুষ্ঠ (thumb) এর প্রান্তদেশের আয়তন অপেক্ষা অধিক হয়, সেই অবস্থাকে গলগণ্ড বা গয়টার বলে। থাইরয়েড গ্রন্থির আকৃতি ও আয়তন অনুসারে গলগণ্ড দুরকমের হয়। প্রথম পর্যায়টিতে গ্রন্থিটি অনুভব যোগ্য (palpable goitre) কিন্তু দৃশ্যমান নয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে গ্রন্থিটি অনুভবযোগ্য এবং স্বাভাবিক অবস্থানে দৃশ্যমান (visible goitre) হয়। মোট গলগণ্ডের হার বলতে পর্যায় ১ ও পর্যায় ২ এর মোট সংখ্যাকে বলা হয়। দৃশ্যমান গলগণ্ডের হার বলতে শুধু পর্যায় ২-এর সংখ্যা বোঝায়। কোনো অঞ্চলে মানুষের মধ্যে আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে কিনা পরীক্ষার জন্য এই শ্রেণিবিন্যাসটি গুরুত্বপূর্ণ। যে অঞ্চলে গলগণ্ড রোগ মহামারীর আকার ধারণ করে এবং আয়োডিনের অভাব অত্যন্ত তীব্র হয় সেখানে বামনত্ব লক্ষ্য করা যায়। এই অবস্থায় মানসিক সক্রিয়তা হ্রাস পায় এবং একই সাথে স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়ার প্রতিবন্ধিকতার সৃষ্টি হওয়ায় ত্রুটিপূর্ণ শ্রবণশক্তি ও বাক্‌শক্তি, টেরা (squint) এবং চলাফেলার বিভিন্ন অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পায়। দেহের বৃদ্ধিও ব্যাহত হয়।

গয়টারকে আবার বৃদ্ধির আকৃতি অনুসারে দুভাগে ভাগ করা যায়।
(১) ডিফিউজ গয়টার ও (২) নডিউলার গয়টার। নডিউলার গয়টার আবার দুভাগে ভাগ করা যায় - (১) সলিটারি নডিউলার গয়টার (২) মাল্টি নডিউলার গয়টার।

ডিফিউজ গয়টার ঃ এ ধরণের গয়টারে সমস্ত থাইরয়েড গ্রন্থিটিই সমভাবে বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ গ্রন্থিটির কোথাও কোনো উঁচু, নীচু, অমসৃণ বৃদ্ধি ঘটে না। সমগ্র গ্রন্থিটিই একসাথে ফুলে ওঠে।

নডিউলার গয়টার ঃ ডিফিউজ গয়টারের চিকিৎসা যদি দীর্ঘদিন ধরে না হয় তাহলে তা থেকে নডিউলার গয়টারের সৃষ্টি হয়। যদি একটি মাত্র নডিউল সৃষ্টি হয় তাকে বলে সলিটারি নডিউলার গয়টার। আর অনেকগুলি নডিউল সৃষ্টি হলে তাকে বলে মাল্টি নডিউলার গয়টার। এই সব ধরণের থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি ব্যথা যন্ত্রণা ছাড়াই বেশিরভাগ সময় অবস্থান করে। অনেক সময় T_3 ও T_4 এর মাত্রা রক্তে স্বাভাবিক থাকে।

গয়টার সৃষ্টির কারণ

(১) আয়োডিনের অভাব

(২) অটোইমিউন থাইরয়েড ডিসঅর্ডার যেখানে আয়োডিনের অভাব নেই এমন অঞ্চলে বেশি হয়।

(৩) সালফার ও লিথিয়াম জাতীয় ওষুধ গ্রহণ।

(৪) অতিরিক্ত আয়োডিন যুক্ত ওষুধ ব্যবহার।

(৫) গয়ট্রোজেন জাতীয় পদার্থ খেলেও গয়টার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(৬) কিছু বিশেষ ধরণের ব্যাকটেরিয়া যুক্ত জল পান করলেও গয়টার হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

থাইরয়েড ক্যানসার

প্রাথমিক পর্যায়ে গয়টার হলে সময়মতো চিকিৎসা না করালে থাইরয়েড গ্রন্থিটি ক্যানসারে আক্রান্ত হয়। গয়টারে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে থাইরয়েড ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা প্রায় এক শতাংশ। গ্রন্থিটির অসমান, দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে শক্ত হয়ে যাওয়াটা ক্যানসারের প্রাথমিক লক্ষণ। থাইরয়েড নডিউল গুলি শক্তভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকলে এক সময় ক্যানসারে আক্রান্ত হয়। থাইরয়েড গ্রন্থির ক্যানসারকে মূলত দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা - (১) ডিফারেন্সিয়েটেড্ (২) আন্ডিফারেন্সিটেড্ থাইরয়েড ক্যানসার।

ডিফারেন্সিয়টেড থাইরয়েড্ ক্যানসার আবার তিন রকমের যথা -

(১) প্যাপিলারি থাইরয়েড ক্যানসার (৬০-৭০ শতাংশ আক্রান্ত হন)।

(২) ফলিকিউলার থাইরয়েড ক্যানসার (১৫-২০ শতাংশ আক্রান্ত হন)।

(৩) মেডালরি থাইরয়েড ক্যানসার (৫-১০ শতাংশ আক্রান্ত হন)।

প্যাপিলারি থাইরয়েড ক্যানসার সাধারণতঃ ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সীদের বেশি হয়। সাধারণত কম বয়সে গলার কোনো চিকিৎসায় রেডিওথেরাপি ব্যবহার করা হলে এই ধরণের ক্যানসার হতে দেখা যায়। ৩০ বছরের বেশি বয়সীদের ফলিকিউলার থাইরয়েড ক্যানসার আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেশি। মেডালরি ক্যানসার স্পোরাডিক্যালি হতে পারে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ক্যানসার বংশগত কারণেও হয়। সাধারণতঃ ৫০ বছরের বেশি বয়সীদের আ্ডিফারেন্সিয়েটেড্ ক্যানসার হতে দেখা যায়। দীর্ঘদিন অবহেলার ফলে ডিফারেন্সিয়েটেড্ ক্যানসার থেকে পরিবর্তিত হয়ে আনডিফারেন্সিয়েটেড ক্যানসারের সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ ক্যানসারে আক্রান্ত হলে থাইরয়েড গ্রন্থিটি অস্ত্রোপচার করে পুরো বা প্রায় পুরো বাদ দিয়ে দেওয়া হয়।

এছাড়াও রেডিয়েশেন থেরাপি, হরমোন থেরাপি ও কেমেথেরাপির মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়। রেডিয়েশন

থেরাপিতে ক্যানসার কোষ মারতে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন এক্স-রে ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে হরমোন থেরাপিতে হরমোন ওষুধ ব্যবহার করে ক্যানসার কোষকে আর বাড়তে দেওয়া হয় না। কেমোথেরাপিতে ওষুধ প্রয়োগ করে ক্যানসার কোষকে মারা হয়।

হাইপোথাইরয়েডিজম

থাইরয়েড সমস্যার শতকরা ৭০ ভাগ রোগী হাইপোথাইরয়েডিজম এ আক্রান্ত। এর বিভিন্ন উপসর্গগুলি হয় -

- ক্লান্তি ভাব/অলস্যভাব/অবসন্ন/ঘুম-ঘুমভাব/চোখে ঢুলু-ঢুলু ভাব।
- গা-হাত-পায়ে সবসময় একটা ব্যথার অনুভূতি।
- পেশি ও হাড়ের সন্ধিতে ব্যথা।
- অতিরিক্ত ঠাণ্ডা অনুভব করা। গরমেও গায়ে ঘাম হয় না।
- হঠাৎ ওজন বেড়ে যাওয়া।
- চুল রুক্ষ ও শুকনো হয়ে যাওয়া।
- চোখ, মুখ, হাত ও পায়ে ফোলাফোলা ভাব।
- কোষ্ঠকাঠিন্য।
- গলার আওয়াজ ভেঙে যাওয়া।
- নখ ভেঙে যাওয়া।
- পড়াশুনা সহ সবকিছু ভুলতে থাকা।
- রক্তে কোলেস্টরলের মাত্রা বেড়ে যাওয়া।
- যৌন উত্তেজনা কমে যায়।
- বারবার গর্ভপাত হয়।
- স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ঋতুস্রাব।
- অ্যালার্জি, চুলকানি, ঘামাচি অসম্ভব বেড়ে যাওয়া।
- রোগীর ডায়াস্টলিক ব্লাড প্রেসার বেড়ে যায়।
- কারোর কারো ক্ষেত্রে অ্যানিমিয়াও দেখা দিতে পারে।

হাইপারথাইরয়েডিজম

থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে অধিক মাত্রায় হরমোন নিঃসৃত হলে হাইপারথাইরয়েডিজম হয়। এই রোগের সঙ্গে গয়টারও দেখা যায়। সাধারণ লক্ষণগুলি হল -

- অবসাদ, মাথাব্যথা, ওজন হ্রাস, হৃদস্পন্দন ইত্যাদি।
- মহিলাদের ক্ষেত্রে অনিয়মিত ঋতুচক্র, কম স্রাব।

- অতিরিক্ত ঘাম হওয়া, অনিদ্রা, অস্থিরতা, উত্তেজনা।
- বুক ধড়ফড়, হীনমন্যতা নার্ভাস অনুভূতি লক্ষ করা যায়।
- বাহু ও উরুর পেশির দুর্বলতা, হাত কাঁপা বা ট্রেমার।
- থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি বা গয়টার।
- চোখের দৃষ্টি অস্পষ্ট, দৃষ্টির সমস্যা, চোখে ফোলা ভাব, চোখ লাল।
- গরম, ভিজে ত্বক।
- বমি, চুলকানি, হার্টফেলিওর, স্ট্রোক ও মানসিক ব্যাধি।
- বারবার মলত্যাগ, পেটখারাপ।

হাইপার থাইরয়েডিজম সবথেকে বেশি হয় গ্রেভস ডিজিজের কারণে। এটি এক ধরণের অটোইমিউন ডিসঅর্ডার। গ্রেভস ডিজিজের কারণে হাইপার থাইরয়েডিজম-এর লক্ষণগুলি হল -

- চোখ অস্বাভাবিক লালচে লাগা।
- চোখ অনেক সময় ট্যারা হয়ে যেতে দেখা যায়।
- চোখের পাতার ছন্দোবদ্ধতা নষ্ট হয়ে যায়।
- চোখের মণির স্বাভাবিক নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়।
- চোখের মণি অনেক সময় কোঠর ঠেলে সামনে বেরিয়ে আসে।
- দীর্ঘদিন চিকিৎসা না হলে রোগী অন্ধও হয়ে যায়।

থাইরয়েড সংক্রান্ত পরীক্ষা

থাইরয়েড গ্রন্থির বা গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোনের কোনো গণ্ডগোল দেখা গেলে তা সঠিকভাবে নির্ণয় হবার জন্য বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা করা হয়। এগুলো হল -

(১) T_3,T_4 ও TSH পরীক্ষা ঃ রক্তে T_3 এবং T_4 হরমোন দুভাবে থাকতে পারে। প্রথমত, এই দুই হরমোনের বেশিরভাগ অংশই থাকে প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায়। দ্বিতীয়ত এই দুই হরমোনের খুব সামান্য অংশ থাকে মুক্ত অবস্থায়। এদের মুক্ত T_3 এবং T_4 বলে। হরমোনের এই অংশই সক্রিয়। সাধারণভাবে রক্ত পরীক্ষায় পুরো পরিমাপই মাপা হয়। প্রোটিন যুক্ত T_3, T_4 এবং মুক্ত T_3, T_4 মিলিয়ে যে পরিমাণটা হয় তাকেই চিকিৎসা বিজ্ঞানে টোটাল অ্যামাউন্ট বলে।

কিন্তু টোটাল অ্যামাউন্ট মাপার প্রধান অসুবিধা হল রক্তে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি হলে থাইরয়েড গ্রন্থির কোনো সমস্যা না থাকলেও রক্তে T_3 এবং T_4 এর মাত্রা স্বাভাবিক মাত্রার থেকে বেশি হতে পারে। ফলে পরীক্ষার ফল ভুল পথ নির্দেশ করতে পারে। তাই মুক্ত T_3 এবং T_4 এর মাত্রাই মাপা বিজ্ঞান সম্মত। প্রতিটি ক্ষেত্রে অবশ্য ফ্রি T_3 ও ফ্রি T_4 দুটি পরীক্ষার দরকার নেই। যাদের হাইপারথাইরয়েডিজম বলে সন্দেহ করা হচ্ছে তাদের রক্তের ফ্রি T_3 বা টোটাল T_4 এবং TSH এর মাত্রা নির্ণয় করা হয়।

হরমোনের নাম	স্বাভাবিক মাত্রা
T_3	০.৮ - ২ ন্যানোগ্রাম / মিলি.
ফ্রি T_3	২ - ৫ পিকোগ্রাম / মিলি.
T_4	৫ - ১২ মাইক্রোগ্রাম / ডেসিলি.
ফ্রি T_4	০.৯ - ২ ন্যানোগ্রাম / ডেসিলি.
TSH	০.৩৫ - ৬ মাইক্রো ইউনিট / মিলি.

(২) রেডিও অ্যাকটিভ আয়োডিন আপটেক টেস্ট ঃ থাইরয়েড গ্রন্থি আয়োডিন গ্রহণ করে এবং সেই আয়োডিনকে কাজে লাগিয়ে থাইরয়েড হরমোন তৈরি করে। তেজস্ক্রিয় আয়োডিনও একইভাবে থাইরয়েড গ্রন্থি গ্রহণ করে ও কাজে লাগায়। সাধারণ মুখ দিয়ে ওষুধের মধ্যে ২০ শতাংশ মাত্রার মতো তেজস্ক্রিয় আয়োডিন ট্যাবলেট শরীরে দিলে শরীরের থাইরয়েড গ্রন্থি তা ২৪ ঘন্টার মধ্যে কাজে লাগায়। এই পদ্ধতিতে ওষুধ প্রয়োগ করে থাইরয়েড গ্রন্থিতে তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব লক্ষ্য করা হয়। গ্রেভস ডিজিজ, সাধারণ হাইপার থাইরয়েডিজম, থাইরয়েডাইটিস প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত রোগীদের এই তেজস্ক্রিয় আয়োডিন গ্রহণ বিভিন্ন হবে। এই পরীক্ষা করার জন্য রোগীকে পরপর তিনদিন ল্যাবরেটারিতে যেতে হয়।

(৩) ফাংশন্যাল স্ক্যান ঃ এই পরীক্ষাটি রেডিও আইসোটোপের সাহায্যে করা হয় বলে একে 'রেডিও আইসোটোপ স্ক্যান' বলা হয়। থাইরয়েড গ্রন্থিতে যদি সলিটরি নডিউল থাকে অর্থাৎ গুটি বা দানার সৃষ্টি হয় সেই নডিউলটি ক্যানসার গ্রস্ত কিনা তাও অনুমান করা যায় এই পরীক্ষীর মাধ্যমে।

(৪) স্ট্রাকচারাল স্ক্যান ঃ এই পরীক্ষা পদ্ধতিতে কোন নডিউল সিস্টিক অর্থাৎ জলীয় পদার্থে ভর্তি না সলিড তা বোঝার জন্য আলট্রাসাউন্ড স্ক্যানের ব্যবহার হয়। যদি দেখা যায় নডিউলটি সিস্টিক তাহলে প্রায় নির্ভুলভাবে বলা যায় এটি ক্যানসারের কারণে হয়নি। এছাড়া হাতে অনেক সময় একটা নডিউল ঠেকলেও এই স্ক্যানে বোঝা যায় এটা একটাই না অনেকগুলো। যদি নডিউলের সংখ্যা অনেক হয় তাহলেও বলা যায় রোগীর থাইরয়েড ক্যানসার হবার সম্ভাবনা কম।

(৫) থাইরয়েড বায়োপ্সি ঃ যে সমস্ত রোগী থাইরয়েড নডিউল আক্রান্ত, তাঁদের ক্ষেত্রে 'থাইরয়েড বায়োপসি' একটি বহুল প্রচলিত পরীক্ষা। একটি সিরিঞ্জের সূচের সাহায্যে থাইরয়েড গ্রন্থির অস্বাভাবিক অংশ থেকে কিছু কোষ বাইরে নিয়ে পরীক্ষা করা হয়। সামান্য ফোলাভাব ও ব্যথা হলেও কোনোরকম পরিবর্তন থাইরয়েড গ্রন্থিতে হয় না এবং এই পরীক্ষার পদ্ধতির মাধ্যমে ক্যানসারও ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে না। পদ্ধতিটি চলাকালীন শিশুদের ক্ষেত্রেও এই অঞ্চল অবশ করার প্রয়োজন হয় না। যদি কোনরকম

ফোলাভাব বা নডিউল না থাকে তবে থাইরয়েড বায়োপসি করা হয় না। থাইরয়েড নোডিউল, গয়টার (একাধিক নোডিউল যুক্ত) বা সম্ভাব্য থাইরয়েডাইটিসের চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে বায়োপসির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি ৮৫-৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে নোডিউলের অবস্থা এবং থাইরয়েড গ্রন্থির টিউমার ক্যানসারে সম্ভাব্যতা প্রমাণে বায়োপসি কার্যকরী।

(৬) থাইরয়েড অ্যান্টিবডি ঃ এই পরীক্ষার মাধ্যমে রক্তে অ্যান্টি পার অক্সিডেজ এবং অ্যান্টি থাইরোগ্লোবিউলিনের মাত্রা পরীক্ষা করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রক্তে T_3 এবং T_4 এর মাত্রা স্বাভাবিক থাকলেও **TSH** এর মাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পায় সাধারণতঃ এই ধরণের অস্বাভাবিকতার জন্য রোগীর কোনো বাহিক্য লক্ষণ থাকে না। একে সাবক্লিনিক্যাল হাইপোথাইরয়েডিজম বলে। এই সমস্ত রোগীদের মধ্যে যাদের অ্যান্টিবডি টেস্ট পজিটিভ তাদের অদূর ভবিষ্যতে ওভার্ট হাইপোথাইরয়েডিজম দেখা দিতে পারে।

অ্যান্টিবডি	স্বাভাবিক মাত্রা
অ্যান্টিপারঅক্সিডেজ	< ৪০ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট/মিমি.
অ্যান্টিথাইরোগ্লোবিউলিন	< ১২০ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট/মিমি.
	< = কম।

থাইরয়েড সংক্রান্ত পরীক্ষাগুলি খুবই অনুভূতিপ্রবণ বলে বিশ্বস্ত ল্যাবরেটরি থেকেই পরীক্ষাগুলো করানো উচিত।

গয়ট্রোজেন

পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান থাইরয়েড গ্রন্থির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও কার্যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। থাইরয়েড গ্রন্থি স্ফীত বা গলগণ্ড সৃষ্টিকারী উপাদান সমূহকে গয়ট্রোজেন বা থাইরয়েড বিরোধক উপাদান বলে। এই উপাদানগুলি খাদ্য কিংবা জলের মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। এই উপাদানগুলি সরাসরি থাইরয়েড গ্রন্থির উপর ক্রিয়া করে গ্রন্থিটিকে স্ফীত করে অথবা পরোক্ষভাবে থাইরয়েডগ্রন্থির নিয়ন্ত্রণকারী হরমোনসমূহকে প্রভাবিত করে বা কার্যস্থলে থাইরয়েড হরমোনের বিপাক ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটিয়ে বা দেহ থেকে এই হরমোনের রেচন বৃদ্ধি করে। ব্রাসিকা গোত্রের কিছু সব্জি যথা বাঁধাকপি, ওলকপি, সরষে শাক প্রভৃতি খেলে গয়টার হবার সম্ভাবনা থাকে। সয়াবিন খেলেও গয়টার হবার সম্ভাবনা থাকে। তবে যাদের থাইরয়েড গ্রন্থিতে কোনো সমস্যা নেই তাদের এই সমস্ত খাদ্য গ্রহণে সাধারণত গয়টার হবার সম্ভাবনা থাকে না। প্রকৃতপক্ষে সব্জিগুলিতে এমন কিছু যৌগ থাকে যেগুলি থাইরয়েড গ্রন্থিতে আয়োডিনের প্রবেশকে বাধা দিতে সাহায্য করে। সেই যৌগগুলি হল সায়ানোজেনিক গ্লুকোসাইড, গ্লুকোসিনোলেট ও থায়োসায়ানেট। ভারতীয় বংশোদ্ভুত বাঁধাকপি ও ফুলকপিতে গ্লুকোসিনোলেটের পরিমাণ সর্বাধিক। সরষে, মুলো ও ওলকপিতে থায়োসায়ানেট সর্বাধিক। ব্যাম্বুসুট ও ক্যাসাভাতে যেগুলি কেরালা ও ত্রিপুরার লোক বেশি করে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে, তাতে

সায়ানোজেনিক গ্লুকোসাইডের পরিমাণ সর্বাধিক দেখা গেছে যদিও প্রত্যেকটি সব্জিতেই প্রত্যেকটি যৌগের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। কাঁচা অবস্থায় এই যৌগগুলি সব্জিগুলোতে যতটা সক্রিয় থাকে, ভালো করে ফুটিয়ে নিয়ে জল পৃথক করে নিলে সক্রিয়তা বহুলাংশে হ্রাস পায়। তাই এই ধরণের সব্জিগুলি গলগণ্ডরোগী কেন, সাধারণ মানুষেরও কাঁচা অবস্থায় না খেয়ে ফোটানোর পর জল নিঃসরণ করে সিদ্ধ অংশ রান্না করে খাওয়াই ভাল।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে জল থেকে গয়টার হবার সম্ভাবনা থাকে। কারও কারও মতে যে সব অঞ্চলের মানুষ খরজল পান করে তাদের মধ্যে গলগণ্ড রোগের প্রকোপ অপেক্ষাকৃতভাবে মৃদু জল পান করে এমন স্থানের মানুষের অপেক্ষা বেশি, যদিও মৃদু জল ব্যবহারকারী মানুষদের মধ্যেও এই রোগ দেখা গেছে। এছাড়াও পানীয় জলে অধিক পরিমাণে লিথিয়াম সহ বেশ কিছু হাইড্রোকার্বন যুক্ত পদার্থ দেখা যায়। যেগুলি গয়টার সৃষ্টিতে সাহায্য করে। জলে কিছু বিশেষ ধরণের ব্যাকটিরিয়া (ই.কোলি) দূষণ হলে, সেই জল পান করলে গয়টার হবার সম্ভাবনাও দেখা যায়।

চিকিৎসা

থাইরয়েড সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগ অনুযায়ী ওষুধ ও তার মাত্রা বিভিন্ন হয় যা কেবলমাত্র একজন অভিজ্ঞ স্পেশালিস্ট ডাক্তারই ঠিক করতে পারেন। তাই সমস্যা দেখা দিলেই ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। হাইপোথাইরয়েড চিকিৎসার ক্ষেত্রে রোগীর বেশ কিছু তথ্য জেনে রাখা জরুরী। যেমন -

(১) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিকিৎসা আজীবন প্রয়োজন। কারণ বাইরে থেকে প্রয়োগ করা ওষুধ থাইরয়েড গ্রন্থিকে সারিয়ে তোলে না, বরং থাইরয়েড গ্রন্থি যে পরিমাণ হরমোন তৈরি করে, মোটামুটি সেই পরিমাণে ওষুধ বাইরে থেকে প্রয়োগ করে, তার কাজ চালিয়ে নেওয়া হয়। কাজেই ওষুধ খেয়ে রক্তের হরমোণের পরিমাণ স্বাভাবিক সীমায় এলেও ওষুধ বন্ধ করা যায় না। বরং তা একইভাবে খেয়ে যেতে হয়। কাজেই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ বন্ধ করা অনুচিত।

(২) ওষুধ সকালে খালি পেটে খাওয়া আবশ্যক।

(৩) ঋতু ভেদে ওষুধের তারতম্য হয় না। তবে কিছু ক্ষেত্রে হাইপোথাইরয়েড রোগীর ওষুধের মাত্রা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় - যেমন, যক্ষা রোগে আক্রান্ত রোগী বা খিঁচুনির জন্য যাঁরা ওষুধ খাচ্ছেন অথবা মানসিক রোগে আক্রান্ত রোগী। বার্ধক্যেও প্রায়ই এই ওষুধের মাত্রা হ্রাসের প্রয়োজন হয়।

(৪) কোন হাইপোথাইরয়েড মহিলা গর্ভধারণ করলে, কোনো অবস্থাতেই ওষুধ বন্ধ করা উচিত নয়। বরং এক্ষেত্রে প্রায়শই ওষুধ ২০-৫০ শতাংশ বাড়ানোর প্রয়োজন হয়, নতুবা গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ ব্যাহত হতে পারে। এক্ষেত্রে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতেও কোনো অসুবিধা নেই।

বহরমপুর গার্লস কলেজ পুরস্কার - ২০১৯

বহরমপুর গার্লস কলেজের যে ছাত্রীরা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে সর্বোচ্চ স্থানাধিকার করেছে, তার নাম ঘোষণা করা হচ্ছে। তার কৃতিত্বে কলেজ বিশেষ পুরস্কার প্রদান করছে।

জ্যোতি রুংটা বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম - ২০১৮

এছাড়া ২০১৮ সালে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিবার্ষিক স্নাতক স্তরে ৫ টি বিষয়ে আমাদের ছাত্রীরা শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। এবার তাদের নাম ঘোষণা করা হচ্ছে।

১। শারীর বিদ্যায় — প্রথম — জ্যোতি রুংটা

২। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে — প্রথম — পাপিয়া হালদার

৩। অর্থনীতিতে — প্রথম — দিয়া পোদ্দার

৪। উদ্ভিদ বিদ্যায় — প্রথম — অঙ্কিতা চক্রবর্ত্তী

৫। কমিউনিকেটিভ ইংলিশ এ - প্রথম — শৈলী দে

ত্রিবার্ষিক স্নাতক সাম্মানিক বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা - ২০১৮

১। স্নাতক সাম্মানিক প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ও কলেজের শেষ্ঠ ছাত্রীঃ
অমিয়া রাও স্মৃতি পদক — জ্যোতি রুংটা

২। স্নাতক সাম্মানিক (কলা ও বিজ্ঞান একত্রে) প্রথম শ্রেণীতে প্রথমঃ
প্রীতি গুপ্ত স্মৃতি পদক — জ্যোতি রুংটা

৩। স্নাতক সাম্মানিক কলাবিভাগে প্রথমঃ
সুরমা দেবী স্মৃতি পদক — সুপ্রীতা সরকার

৪। স্নাতক সাম্মানিক কলাবিভাগে প্রথমঃ
শোভনা দেবী স্মৃতি পুরস্কার — সুপ্রীতা সরকার

৫। স্নাতক সাম্মানিক কলা বিভাগে প্রথমঃ
ইন্দুলেখা চক্রবর্ত্তী স্মৃতি পুরস্কার — সুপ্রীতা সরকার

৬। স্নাতক সাম্মানিক সংস্কৃতে প্রথমঃ সুপ্রীতা সরকার
ক) অরুণ প্রকাশ স্মৃতি পুরস্কার
খ) অধ্যাপক কালিকাচরণ স্মৃতি পুরস্কার
গ) অধ্যাপিকা বিভা সেন স্মৃতি পুরস্কার
ঘ) কলেজ পুরস্কার

৭। স্নাতক সাম্মানিক দর্শনে প্রথমঃ হাফিজা খাতুন
ক) অধ্যাপক কালিহর সরকার স্মৃতি পুরস্কার

খ) অধ্যাপিকা নীলিমা চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার

গ) সুমঙ্গলা সমাদ্দার স্মৃতি পুরস্কার

ঘ) কণিকা কল্পনা রায়বর্ধন স্মৃতি পুরস্কার — নগদ অর্থ ২০০০/-

ঙ) শুভা গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার

চ) শুভা গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার — নগদ অর্থ ১০০০/-

ছ) কলেজ পুরস্কার

৮। স্নাতক সাম্মানিক ইতিহাসে প্রথমঃ পৌলমী সরকার

ক) শর্মিষ্ঠা স্মৃতি পুরস্কার

খ) অধ্যাপক অশোক কুমার সরকার স্মৃতি পুরস্কার

গ) কলেজ পুরস্কার

৯। স্নাতক সাম্মানিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রথমঃ পাপিয়া হালদার

ক) নীরদবরণ স্মৃতি পুরস্কার

খ) অধ্যাপক গৌতম উপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার

গ) কলেজ পুরস্কার

১০। স্নাতক সাম্মানিক বাংলায় প্রথমঃ অঙ্কনা ব্যানার্জী

ক) অঞ্জলি স্মৃতি পুরস্কার

খ) অমূল্যচরণ মণ্ডল স্মৃতি পুরস্কার

গ) কলেজ পুরস্কার

১১। স্নাতক সাম্মানিক ইংরাজীতে প্রথমঃ শ্রদ্ধা সরকার

ক) বাসন্তী দেবী স্মৃতি পুরস্কার

খ) নিবেদিতা সাহা স্মৃতি পুরস্কার

গ) সুমিতা রায় স্মৃতি পুরস্কার

ঘ) কমলা ভট্টাচার্য্য স্মৃতি পুরস্কার

ঙ) শুভঙ্কর ভট্টাচার্য্য স্মৃতি পুরস্কার

চ) ডঃ সুবর্ণা ব্যানার্জী (নী মুখার্জী) স্মৃতি পুরস্কার

ছ) কলেজ পুরস্কার

১২। স্নাতক সাম্মানিক সমাজবিজ্ঞানে প্রথমঃ বর্ষা ঘোষ

ক) নন্দরানী মুখার্জী স্মৃতি পুরস্কার

খ) সুমঙ্গলা সমাদ্দার স্মৃতি পুরস্কার

গ) কলেজ পুরস্কার

১৩। স্নাতক সাম্মানিক বিজ্ঞান বিভাগে প্রথমঃ জ্যোতি রুংটা

ক) অধ্যাপক রেজাউল করিম স্মৃতি পুরস্কার

খ) ভবানীশঙ্কর দে স্মৃতি পুরস্কার

১৪। স্নাতক সাম্মানিক পদার্থবিদ্যায় প্রথম ঃ — স্বস্তিকা দাস

ক) নিবেদিতা স্মৃতি পুরস্কার

খ) কলেজ পুরস্কার

১৫। স্নাতক সাম্মানিক রসায়নে প্রথমঃ — করুণাময়ী মণ্ডল

ক) অধ্যাপক দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার

খ) সাংখ্য কপিল সেন স্মৃতি পুরস্কার

গ) কলেজ পুরস্কার

১৬। স্নাতক সাম্মানিক গণিতে প্রথমঃ — সুদেষ্ণা চৌধুরী

ক) শঙ্করী পাল স্মৃতি পুরস্কার

খ) কল্যাণী সেনগুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার

গ) কলেজ পুরস্কার

১৭। স্নাতক সাম্মানিক শারীরবিদ্যায় প্রথমঃ — জ্যোতি রুংটা

ক) ডঃ ভোলানাথ রায় স্মৃতি পুরস্কার

খ) সুষমা চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার

গ) কলেজ পুরস্কার

১৮। স্নাতক সাম্মানিক প্রাণীবিদ্যায় প্রথমঃ — সৌম্যদীপা দাস

ক) রুক্মিনীকান্ত সরকার স্মৃতি পুরস্কার

খ) কৃষ্ণচন্দ্র মুখার্জী স্মৃতি পুরস্কার

গ) কলেজ পুরস্কার

১৯। স্নাতক সাম্মানিক উদ্ভিদবিদ্যায় প্রথমঃ — অঙ্কিতা চক্রবর্তী

ক) মীরা কর স্মৃতি পুরস্কার

খ) কলেজ পুরস্কার

২০। স্নাতক সাম্মানিক অর্থনীতিতে প্রথমঃ — দিয়া পোদ্দার

ক) মায়া দে স্মৃতি পদক

খ) কলেজ পুরস্কার

২১। স্নাতক সাম্মানিক পরিবেশ বিজ্ঞানে প্রথমঃ — নিষ্ঠা সাউ

২২। স্নাতক T.T.M. এ প্রথমঃ — ছাত্রী নেই

২৩। স্নাতক কমিউনিকেটিভ ইংলিশে প্রথমঃ — শৈলী দে

২৪। স্নাতক সাধারণ (কলা ও বিজ্ঞান একত্রে) বিভাগে প্রথমঃ

বুক কর্ণার প্রদত্ত— — অনুশ্রী মণ্ডল

২৫। স্নাতক সাধারণ কলাবিভাগে প্রথম ঃ — সুস্মিতা দত্ত

ক) হেমলতা স্মৃতি পুরস্কার
খ) রাজলক্ষী স্মৃতি পুরস্কার
গ) কলেজ পুরস্কার

২৬। স্নাতক সাধারণ বিজ্ঞান বিভাগে প্রথমঃ — তনুশ্রী মণ্ডল
ক) প্রতিভাময়ী দাশশর্মা স্মৃতি পুরস্কার
খ) কলেজ পুরস্কার

২৭। স্নাতক সাধারণ ইংরাজীতে প্রথমঃ — রিয়া মোরে
ক) মঞ্জু চক্রবর্ত্তী স্মৃতি পুরস্কার

২৮। স্নাতক সাম্মানিক সংস্কৃতের শ্রেষ্ঠ ছাত্রীঃ — সুপ্রীতা সরকার

প্রাক্তনী মাধবী ঘোষ প্রদত্ত পুরস্কার
স্নাতকোত্তর বিভাগ

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে প্রথম — স্নিগ্ধা ব্যানার্জী ২০১৭
বাংলায় প্রথম ২০১৮ — অদিতি মিশ্র

এছাড়াও অধ্যাপক মনোরঞ্জন সাহা কর্তৃক প্রদত্ত Dr. Chaitali Saha Memorial Fund, বাংলা বিভাগের মেধাবী ও আর্থিকভাবে দুর্বল ছাত্রীদের সাহায্যার্থে এককালিন আড়াই লক্ষ টাকা প্রদান করেছেন। সেই টাকারসুদ থেকে প্রতি বছর B.A. ও M.A. এর প্রত্যেক বর্ষের একজন করে মোট পাঁচ জন মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্রীকে সাহায্য করা হয়।

স্নাতক সাম্মানিক বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা দ্বিতীয় পর্ব — ২০১৮

১। সাম্মানিক বাংলায় প্রথমঃ — সালমা সুলতানা
২। সাম্মানিক ইংরাজীতে প্রথমঃ — ফাল্গুনী পাল
৩। সাম্মানিক সংস্কৃতে প্রথমঃ — দেবযানী চৌধুরী
৪। সাম্মানিক দর্শনে প্রথমঃ — সুইটি সুলতানা
ক) শুভা গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার নগদ অর্থ ১০০০/-
৫। সাম্মানিক ইতিহাসে প্রথমঃ — মরজিনা খাতুন
৬। সাম্মানিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রথমঃ — সুস্মিতা সিংহ রায়
৭। সাম্মানিক সমাজবিজ্ঞানে প্রথমঃ — প্রীতি মণ্ডল, শ্রেয়া সরকার
৮। সাম্মানিক পদার্থ বিদ্যায় প্রথমঃ — হৈমন্তী মণ্ডল
৯। সাম্মানিক রসায়নে প্রথমঃ — মৌমিতা ধর, অঙ্গনা সুলতানা

১০।	সাম্মানিক গণিতে প্রথমঃ	রিয়া ঘোষ
১১।	সাম্মানিক শারীরবিদ্যায় প্রথমঃ	বিদিশা সাহা
১২।	সাম্মানিক প্রাণীবিদ্যায় প্রথমঃ	জয়িতা বাগচী
১৩।	সাম্মানিক উদ্ভিদবিদ্যায় প্রথমঃ	সহেলী রায় চৌধুরী
১৪।	সাম্মানিক পরিবেশবিজ্ঞানে প্রথমঃ	সঙ্গীতা কুমারী
১৫।	সাম্মানিক ভূগোলে প্রথমঃ	অঙ্কিতা দাস
১৬।	সাম্মানিক অর্থনীতিতে প্রথমঃ	অরিজিতা চক্রবর্ত্তী
১৭।	কমিউনিকেটিভ ইংলিশে প্রথমঃ	অয়ন্তিকা ঘোষ
১৮।	T.T.M. এ প্রথমঃ	সঙ্গীতা রায়
১৯।	স্নাতক সাধারণ কলাবিভাগে প্রথমঃ	তনুশ্রী ঘোষ
২০।	স্নাতক সাধারণ বিজ্ঞান বিভাগে প্রথমঃ	অদ্রিজা ব্যানার্জী

স্নাতক সাম্মানিক বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা প্রথম পর্ব — ২০১৮

১।	সাম্মানিক বাংলায় প্রথমঃ	নন্দিতা পাল
২।	সাম্মানিক ইংরাজীতে প্রথমঃ	সুমিতা মণ্ডল
৩।	সাম্মানিক সংস্কৃতে প্রথমঃ	সুমি হালদার
৪।	সাম্মানিক দর্শনে প্রথমঃ	পায়েল খাতুন
	ক) শুভা গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার নগদ অর্থ ১০০০/-	
৫।	সাম্মানিক ইতিহাসে প্রথমঃ	অহনা চক্রবর্ত্তী
৬।	সাম্মানিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রথমঃ	অনুষা সরকার
৭।	সাম্মানিক সমাজবিজ্ঞানে প্রথমঃ	মনীষা মণ্ডল
৮।	সাম্মানিক পদার্থবিদ্যায় প্রথমঃ	মৌমা বিশ্বাস
৯।	সাম্মানিক রসায়নে প্রথমঃ	সায়ন্তি সেনাপতি
১০।	সাম্মানিক গণিতে প্রথমঃ	পাপড়ি বানথিয়া
১১।	সাম্মানিক অর্থনীতিতে প্রথমঃ	নাজমা সুলতানা
১২।	সাম্মানিক শারীরবিদ্যায় প্রথমঃ	সৌমি সান্যাল
১৩।	সাম্মানিক প্রাণীবিদ্যায় প্রথমঃ	ঋত্তিকা দে
১৪।	সাম্মানিক উদ্ভিদবিদ্যায় প্রথমঃ	অন্তরা ঘোষ
১৫।	সাম্মানিক পরিবেশবিজ্ঞানে প্রথমঃ	শ্রাবন্তিকা মজুমদার
১৬।	সাম্মানিক ভূগোলে প্রথমঃ	দেবদত্তা হাজরা
১৭।	সাম্মানিক কম্পিউটার সায়েন্স-এ প্রথমঃ	শুভলীনা চ্যাটার্জী ও স্বরনিমা পাঠক

১৮। কমিউনিকেটিভ ইংলিশ এ প্রথমঃ শ্রেয়া স্মিথ

১৯। T.T.M. এ প্রথমঃ ছাত্রী নেই

২০। স্নাতক সাধারণ কলাবিভাগে প্রথমঃ জলি খাতুন

২১। স্নাতক সাধারণ বিজ্ঞানবিভাগে প্রথমঃ রেবেকা সুলতানা

কলেজের বার্ষিক প্রতিযোগিতা সহ পাঠক্রমিক বিষয় — ২০১৮

১। আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

বাংলা কবিতা
- প্রথমঃ সায়নী ঘোষ
- দ্বিতীয়ঃ সহেলী পাল
- তৃতীয়ঃ সহেলী খাতুন

ইংরাজী কবিতা
- প্রথমঃ শ্রীনা রায় চৌধুরী
- দ্বিতীয়ঃ প্রকৃতি কর্মকার
- তৃতীয়ঃ তাজদীনা খাতুন

সংস্কৃত কবিতা
- প্রথমঃ স্বাগতা চক্রবর্ত্তী
- দ্বিতীয়ঃ মেঘা সিং
- তৃতীয়ঃ স্বাতী বিশ্বাস

২। বিতর্ক প্রতিযোগিতা (মায়া দে স্মৃতি পুরস্কার)

পক্ষে
- প্রথমঃ সাইনি চ্যাটার্জী
- দ্বিতীয়ঃ সুস্মিতা সিংহ রায়
- তৃতীয়ঃ মোনালিস চক্রবর্ত্তী

বিপক্ষে
- প্রথমঃ মপাসা রোজ
- দ্বিতীয়ঃ পাপড়ি বান্টিয়া
- তৃতীয়ঃ মৌলিনা চ্যাটার্জী

৩। তাৎক্ষণিক বক্তৃতাঃ
- প্রথমঃ পাপড়ি বান্টিয়া
- দ্বিতীয়ঃ মোনালিসা চক্রবর্ত্তী
- তৃতীয়ঃ নবনীতা পাল

৪। সংগীতঃ

রবীন্দ্রসঙ্গীত
- প্রথমঃ সৌনীতা মণ্ডল

দ্বিতীয়ঃ চন্দনা পাল

তৃতীয়ঃ সৌদীপা মুখার্জী

নজরুলগীতি

প্রথমঃ সোহিনী পাল

দ্বিতীয়ঃ গৈরিকা ঝাঁ

তৃতীয়ঃ চন্দনা পাল

৫। বাংলা প্রবন্ধঃ

প্রথমঃ সহেলী খাতুন

দ্বিতীয়ঃ প্রীতি দাস

৬। ইংরাজী প্রবন্ধ

প্রথমঃ অন্তর্লীনা রায়

দ্বিতীয়ঃ সোমা মণ্ডল, অয়ন্তিকা ঘোষ

তৃতীয়ঃ প্রকৃতিলক্ষী সিংহ

৭। আলপনা প্রতিযোগিতা

প্রথমঃ কেয়া পাল

দ্বিতীয়ঃ শিবানী মণ্ডল

তৃতীয়ঃ বৈশাখী পাল

৮। ক্যুইজ

প্রথমঃ বারব্রতা বিশ্বাস, সায়নী কর্মকার, জয়িতা বাগচী, অরুনিমা লাহা

২০১৮ সালের সেরা গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীঃ

প্রথম সেমেষ্টারঃ মৌসুমী দাস - ভূগোল সাম্মানিক

দ্বিতীয় বর্ষঃ অন্বেষা বিশ্বাস - রসায়ন সাম্মানিক

অহনা চক্রবর্তী - ইতিহাস সাম্মানিক

তৃতীয় বর্ষঃ শ্রীনা রায় চৌধুরী - ইংরাজী সাম্মানিক